আমাদের পরিবেশ

চতুর্থ শ্রেণি

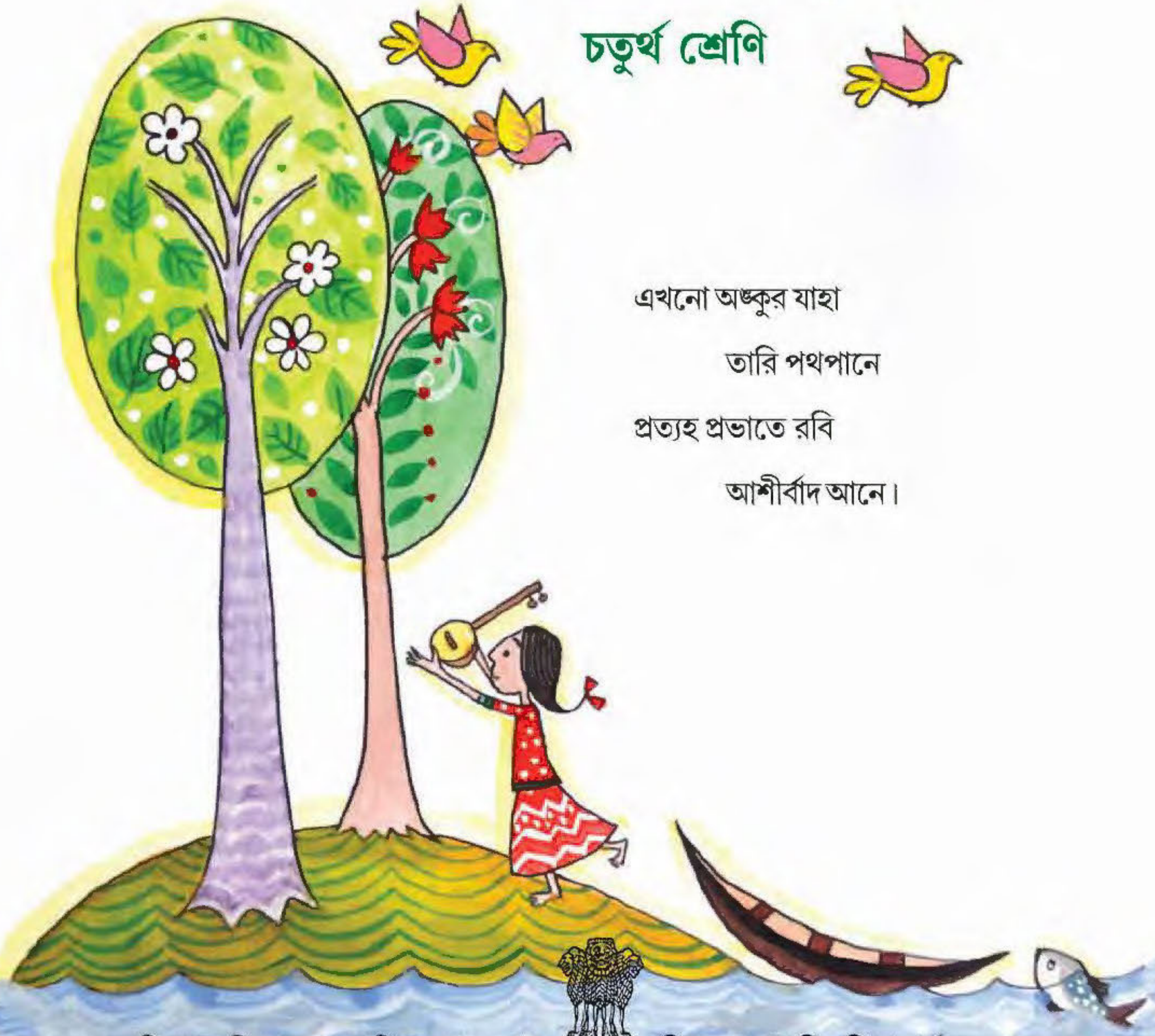

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণির '*আমাদের পরিবেশ*' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে '*জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫*' এবং '*শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯*'- এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে চতুর্থ শ্রেণির '*আমাদের পরিবেশ*' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'*আমাদের পরিবেশ*' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

জুলাই, ২০১৪
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই *জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫* (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') '*আমাদের পরিবেশ*' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তককে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। চতুর্থ শ্রেণি-র '*আমাদের পরিবেশ*' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে '*আমাদের পরিবেশ*' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

জুলাই, ২০১৪

নিবেদিতা ভবন

পঞ্চমতল

বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান

'বিশেষজ্ঞ কমিটি'

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

পার্থপ্রতিম রায় ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ডঃ ধীমান বসু

সুদীপ্ত চৌধুরী ডঃ সন্দীপ রায় দেবাশিস মণ্ডল রুদ্রনীল ঘোষ

দেবব্রত মজুমদার নীলাঞ্জন দাস অনির্বাণ মণ্ডল প্রদীপ কুমার বসাক

রুবি সরকার

পরামর্শ ও সহায়তা

শিরীণ মাসুদ ডঃ শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ডাঃ সুব্রত গোস্বামী

কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য রাজীব রায় কৌশিক সাহা

তন্ময় মৃধা

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ : সম্প্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

অলংকরণ : সম্প্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিরাব্রত ঘোষ

সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল, দীপ্তেন্দু বিশ্বাস, অনুপম দত্ত, পিনাকী দে

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিবেশের উপাদান : জীবজগৎ	১-১৭
পরিবেশের উপাদান : জড়বস্তুর জগৎ	১৮-২৬
শরীর	২৭-৪৫
আবহাওয়া ও বাসস্থান	৪৬-৬৫
আমাদের আকাশ	৬৬-৭৬
প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা	৭৭-৯৯
জীবিকা ও সম্পদ	১০০-১১৭
মানুষের পরিবার ও সমাজ	১১৮-১৩৯
আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ	১৪০-১৫২
স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা	১৫৩-১৬০
রংবাহার	১৬১-১৬৪
আমার পাতা	১৬৫-১৬৬
পাঠ্যসূচি	১৬৭-১৭০
শিখনপরামর্শ	১৭১-১৭৪

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :

'মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইট- পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া নেওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।'

আমরা রবীন্দ্রনাথের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে চেষ্টা করেছি এই পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার। যার সাহায্যে আমাদের পড়ুয়াদের জ্ঞানগঠন সহজে হতে পারে। বিগত এক বছর ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সমাজের বহু মানুষের সুচিন্তিত গঠনমূলক উপদেশ এই পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। আমাদের আশা এই বই পড়ার সময় শিশু পাঠ্যবিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাতে সে আনন্দ পাবে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে 'Appreciation of beauty and art forms is an integral part of human life. Creativity in arts, literature and other domain of knowledge is closely linked. Education must provide the means and opportunities to enhance the child creative expression and the capacity for aesthetic appreciation'। পাঠ্যপুস্তক নির্মাণকালে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ -এর উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথ মান্যতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় ও গঠনমূলক অংশ গ্রহণ, সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা। যেহেতু চলার পথটি কিছুটা হলেও নতুন, তাই এই বই-এর শেষে কিছু শিখন পরামর্শ দেওয়া হলো। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে আপনাদের ভাবনায়। জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

এই বই পাঠে শিশুর জ্ঞান গঠন প্রক্রিয়া যদি এগিয়ে যায় 'আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকে তবেই বইটি সার্থকতা অর্জন করবে।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাব যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম ....

আমার মায়ের নাম ....

আমার বাবার নাম ....

আমার রোল নম্বর ....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম ....

....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম ....

আমাদের জেলার নাম ....

চারপাশের নানা জীব

রেহানা, রিহান, টিপাই, টিকলু ও ইতুরা সবাই মিলে ওদের চারপাশের নানা বন্ধুদের কথা বলছিল। ইতু বলল— মাছেদের কালকে পিঁপড়ের ডিম খাইয়েছি।

রেহানা বলল— কোথা থেকে পেলি?

— বাড়ির পিছন দিকে ঘুরছিলাম। এমন সময় শ্যাওলাধরা একটা ইটে হোঁচট খেলাম। ইটটা গেল উলটে। ওরে বাবা কত পিঁপড়ে। প্রচুর ডিম। দৌড়ে একটা চামচ নিয়ে এসে প্যাকেটে ভরলাম। তারপর মাছেদের খাওয়ালাম। কী মজা করে ওরা খেলে।

এমন সময় দিদিমণি এলেন। ইতুদের বললেন— কী আলোচনা হচ্ছে? টিকলু বলল ওদের আলোচনার কথা।

দিদি বললেন — ইতু, ইটটা কতদিনের পুরোনো?

ইতু বলল — তা অনেক দিনের হবে।

তাহলে দেখো ইটের তলায় পিঁপড়েরা নিজেদের সংখ্যা কত বাড়িয়ে ফেলেছে। ইটের সংখ্যা কিন্তু একই আছে। কেন বলোতো?

রেহানা, রিহানরা সবাই একসঙ্গে বলল— দিদি, ইট থেকে তো ইট হয় না।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ, আসলে ইট হলো জড় পদার্থ।

টিকলু বলল— দিদি, আমাদের পুকুরে কত ব্যাঙাচি হয়েছিল। পরশু দিন বৃষ্টি হলো। আর আমাদের বাড়ির উঠোন জুড়ে কত ছোটো ছোটো ব্যাং। খুব মজা লাগছিল। সবাই মিলে কেমন লাফালাফি করছিল।

দিদি বললেন— বাঃ, বেশ খেয়াল করেছ তো। ঠিক আছে, এবার তোমরা তোমাদের ঘিরে থাকা নানা জীব ও জড় পদার্থের তালিকা করে ফেলো।

তোমাকে ঘিরে থাকা জীবের তালিকা	তোমাকে ঘিরে থাকা জড় পদার্থের তালিকা
১। কুকুর	১। খাট
২। বটগাছ	২। বালি
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।
৬।	৬।

জীবের এত কাজ

দিদিমণি ক্লাসে প্রাণীদের নানা কাজ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সাইনা বলল— দিদি আমাদের তো দুটো হাত আর দুটো পা। তা দিয়ে আমরা কত কাজ করি।

মিন্টু বলল— আমি তো কাঠবেড়ালিকে হাতে ধরে পেয়ারা খেতে দেখেছি। আবার চারপায়ে দৌড়োতেও দেখেছি।

ইতু বলল— পিঁপড়েরা কতদূর থেকে খাবার বয়ে নিয়ে যায়। পায়রা, চড়াই গাছের ডাল ঠোঁটে করে নিয়ে যায় বাসা বাঁধার জন্য।

সুমিতা বলল— কালকে আমাদের বাড়ির বিড়াল ঠিক গন্ধ শুঁকে রান্নাঘর থেকে মাছ খেয়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন— তোমরা তো নানা প্রাণীর কাজ বেশ লক্ষ করেছ।

নীচের তালিকায় নানাধরনের জীবের নানারকম কাজের কথা লেখা আছে। তোমরা দলে আলোচনা করে তোমার পরিচিত কোন কোন জীবকে ওই কাজ করতে দেখেছ তা লেখো।

জীবের নানারকম কাজের তালিকা	জীবের নাম
১। খাবার জোগাড় করা	
২। জায়গা পরিবর্তন করা	
৩। ডিম পাড়া	
৪। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনো	
৫। শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া	
৬।	
৭।	
৮।	

একইরকম জীব যারা

হীরামতিদের বাগানে কত পাখি আসে। ওর ঘুম থেকে ওঠার আগেই পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে যায়। পায়রা, চড়াই, ময়না, টুনটুনি, শালিক আরো কত রকমের নাম-না-জানা পাখি। ঘুম থেকে উঠে হীরামতি পাখিদের মুড়ি খেতে দেয়। সুমিদের পুকুরে আবার নানারকমের মাছ। পুঁটি, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা। সুমি প্রতিদিন ওদের কুঁড়ো খেতে দেয়। তাপস প্রতিদিন সকালে গোরুদের মাঠে বেঁধে দিয়ে আসে। বাবলুদের বাগানে নানারকম গাছ। আম, কাঁঠাল, কুমড়ো, মেহগিনি, কলকে, গাঁদা, জবা, নিম আরও কত কী। নরেশদের পাহাড়ে অবশ্য ঝাউ, পাইন গাছই বেশি দেখা যায়।

(ক) নীচে বিভিন্ন ধরনের জীবের নাম লেখা আছে। তোমরা দলে আলোচনা করে ওদের নীচের ছকে সাজানোর চেষ্টা করো।

১) থানকুনি ২) ব্যাং ৩) সজনে ৪) গরান ৫) বাঘ ৬) শকুন ৭) শিমুল ৮) ব্যাঙের ছাতা ৯) মশা ১০) গন্ডার১১) হরিণ ১২) হাতি ১৩) শ্যাওলা ১৪) গোরু ১৫) ভালুক ১৬) পেয়ারা ১৭) পাইন ১৮) ফার্ন ১৯) মানুষ ২০) শাল

উদ্ভিদ	প্রাণী

(খ) নীচের প্রাণীরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়। সবার খাবার এক নয়। যে যা খায়, তার ভিত্তিতে তাদের আলাদা দলে ভাগ করো :

১) হরিণ ২) বাঘ ৩) কাক ৪) শকুন ৫) গোরু ৬) ভালুক ৭) চড়ুই ৮) মশা ৯) প্রজাপতি ১০) হাতি ১১) সিংহ ১২) রুই ১৩) কুকুর ১৪) বিড়াল ১৫) শালিক ১৬) ভেড়া ১৭) কেঁচো ১৮) ব্যাং ১৯) টিকটিকি ২০) আরশোলা ২১) ইঁদুর

প্রাণীদের নাম	কী খায়

আমরা সবাই মিলে বাঁচব

টিপাইয়ের দাদু রোজ বিকেলে মাঠের ধারে এসে বসেন। খেলা শেষে পিকলু, টিপাইরা দাদুর কাছে নানা কথা শোনে। পিকলু বলল— আমাদের চারপাশে কতরকমের প্রাণী। কতরকমের গাছ। প্রত্যেকেই তো কিছু না কিছু খেয়ে বেঁচে রয়েছে। যদি একদিন সব খাবার শেষ হয়ে যায় তাহলে কী হবে?

দাদু মুচকি হেসে বললেন— তা সহজে হওয়ার নয়। যদি না আমরা সব শেষ করে দিই।

টিপাই বলল— আমরা কী করে শেষ করব?

রীতা বলল— কেন, সাপ তো ইঁদুর খায়। আমরা যদি সব সাপ মেরে ফেলি তবে ইঁদুর এত বেড়ে যাবে যে আমাদের হবে বিপদ।

দাদু বললেন — কয়েক বছর আগেও বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি হলেই কত ব্যাং ডাকত। এখন ওদের সংখ্যা কমে গেছে।

আমিনা বলল— কেন, ওরাও কি খাবার পায় না?

— হ্যাঁ, দিদিভাই ঠিক বলেছ। ব্যাঙেদের খাবার হলো পোকামাকড়। জমিতে পোকা মারার জন্য আমরা বিষ দিই। এতেও ব্যাংরা মরে যেতে পারে।

ডমরু বলল — আমরাও তো অন্য জীবদের ওপর নির্ভর করে থাকি।

টিপাই বলল— হরিণ ঘাস খায়। হরিণকে খায় বাঘ।

নয়ন বলল— চিড়িয়াখানায় জিরাফকে উঁচু গাছের পাতা খেতে দেখেছি। হারুদের ছাগল আবার ছোটো গাছের পাতা খায়।

দাদু বললেন— আমরা সবাই সবার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। এভাবেই আমাদের পরিবেশ টিকে থাকে।

তোমরা দলে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা খোপগুলো ভরাট করো। তির চিহ্ন হচ্ছে কে কাকে খায় তার নির্দেশ। দেখো তো তোমার পরিচিত জীবের দল বেঁচে থাকার জন্য কোন কোন প্রাণীর ওপর নির্ভর করে থাকে।

১। ঘাস → ঘাস ফড়িং → [ ] → সাপ

২। জলের শ্যাওলা → [ ] → মাছরাঙা

৩। ঘাসপাতা → খরগোশ → [ ]

৪। গাছের মূল → [ ] → [ ]

গাছের পাতা ↗ [ ] → [ ]

গাছের পাতা ↘ [ ] → [ ] → [ ]

গাছের কাণ্ড → [ ]

↓

গাছের ফল → [ ] → [ ]

জলের উদ্ভিদ আর ডাঙার উদ্ভিদ

গাছ আর গাছের ফুলগুলো দেখো। তারপর কোনটা কোন গাছ আর কোনটা কোন গাছের ফুল তা খাতায় লিখে ফেলো।

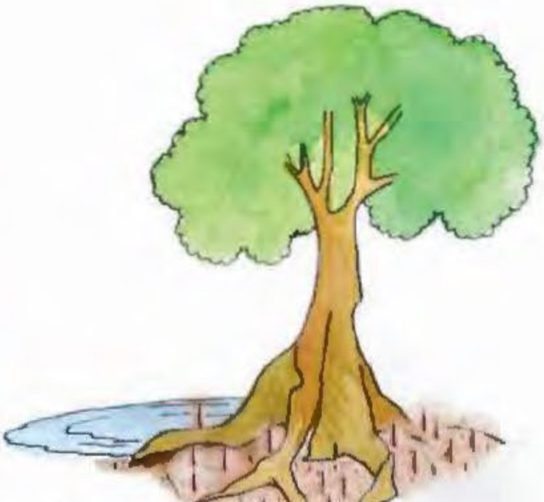

আগের পাতার ছবি দেখো। শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে উদ্ভিদগুলোকে চেনার চেষ্টা করো। তারপর নীচে লেখো।

১। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মানো গাছ	
২। জলের নীচে জন্মানো গাছ	
৩। জলে ভাসমান গাছ	
৪। শুকনো মাটিতে জন্মানো গাছ	
৫। পাহাড়ি জায়গার গাছ	
৬। বালিতে জন্মানো গাছ	
৭। নোনাজলের পাশে জন্মানো গাছ	

তিতলিদের পুকুরে আজ পানা পরিষ্কার করা হবে। রহমানচাচা, বিশুকাকুরা খড় বেঁধে বিরাট দড়ি তৈরি করেছেন। পুরো পুকুরজুড়ে বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর দু-দিক দিয়ে ধীরে ধীরে টান দিলেন। সব পানাগুলো পুকুরপাড়ে জড়ো হয়ে গেল। ফিরোজ, শম্পা, বিল্টুরা এসব দেখছিল।

বিল্টু বলল— জলেতে কতরকম গাছ।

ফিরোজ বলল— ডাঙাতেও তো কতরকম গাছ। বাড়ির ফণীমনসার গায়ে কত কাঁটা। কোনোদিনও জল দিতে হয় না। জিওল গাছে আঠা। শিমুল গাছে তুলো। পলাশ গাছে আগুন-রঙা ফুল। গরানের কাঠ।

তিতলি বলল— গত বছর দার্জিলিং গিয়েছিলাম। সেখানে বড়ো বড়ো পাইনগাছ দেখেছিলাম।

ফিরোজ বলল— চলো একটা কাজ করি। আমাদের এলাকায় জলে আর ডাঙায় নানারকম গাছ আছে। তার তালিকা করে দিদিমণিকে দেখাই।

তোমরা এবার তোমাদের এলাকায় কী কী উদ্ভিদ পাওয়া যায় তা চেনো। উদ্ভিদের ধরন অনুযায়ী তাদের নীচের তালিকায় লেখো।

১। জলের গাছ	
২। ডাঙার গাছ	
৩। কাঁটা আছে এমন গাছ	
৪। ফুল ও ফল হয় এমন গাছ	
৫। বিষাক্ত গাছ	
৬। কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছ	
৭। লতানো গাছ	

নানা ধরনের প্রাণী

নীচের প্রাণীগুলোকে দেখো। তারপর খাতায় তাদের নাম লেখো।

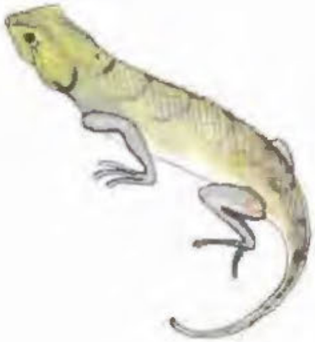

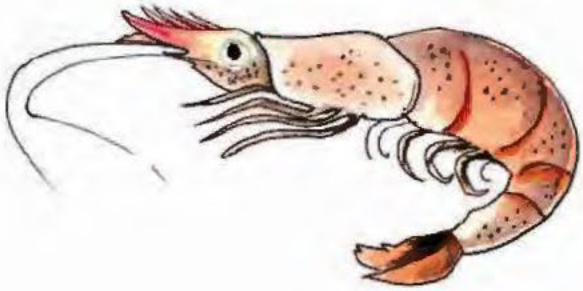

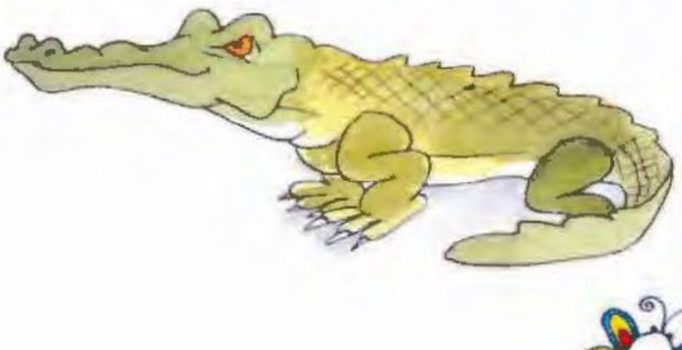

—আমাদের চারপাশে কতরকম প্রাণী রয়েছে বলোতো। কেউ উড়ে বেড়ায়। কেউ সাঁতার কাটে। কেউ চারপায়ে হাঁটে। কেউ দু-পায়ে। কারোর আবার অনেক পা। কেউ আবার **বুকে হেঁটে চলে**। কেউ পাতায় থাকে। কেউ থাকে জলে। কেউ আবার মাটির তলায় বেশ আনন্দে থাকে। সব প্রাণীরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এদের নানারকম রং। এরা প্রত্যেকেই নিজের জায়গায় সুন্দর। এরা নিজের মতো থাকার জায়গা খুঁজে নেয়। খাবার জোগাড় করে। নতুন নতুন প্রাণীর জন্ম দেয়। আবার বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। এইভাবেই পরিবেশে আমরা সবাই মিলে বেঁচে থাকি।

আগের পাতায় কিছু প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে। তাদের দেখো। তারপর দলে মিলে নীচের তালিকাটি পূরণ করো। তারপর তোমরা চারপাশে থাকা নানা প্রাণীর নাম নীচের ছকে লেখো।

জলে থাকে	দেয়ালে থাকে	জলে ও ডাঙায় দুই জায়গাতেই থাকে	গাছে থাকে	বনে থাকে	ফুলে ফুলে ঘোরে	পাতায় থাকে	জলে থাকে, কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না

টিকলু দৌড়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। পায়ের কাছে হঠাৎ একটা কেন্নো এসে গেল। কোনোরকমে থামল টিকলু। কিন্তু একটু ছোঁয়া লাগল। অমনি কেন্নোটা গোল হয়ে গুটিয়ে গেল। আর নড়েও না চড়েও না। খানিকক্ষণ লক্ষ করল টিকলু। তারপর দেখে কেন্নো আস্তে আস্তে তার গুটি খুলে ফেলছে। টিকলু স্কুলে গিয়ে দিদিকে বলল—দিদি, কেন্নোকে ছুঁলেই গোল হয়ে যায়। তবে টিকটিকিকে ছুঁলে তো গোল হয় না।

দিদি বললেন— আমরাও অমন গোল হতে পারব না।

টিপাই বলল— আমাদের তো শিরদাঁড়া আছে। আমরা পারব কী করে?

বাবলু বলল— আরশোলা, পোকামাকড়, কেঁচো, কৃমি সবই কেন্নোর মতোই প্রাণী। শিরদাঁড়া নেই।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ। তবে শিরদাঁড়া থাকলেও অনেক প্রাণী গুটিয়ে থাকতে পারে।

টিকলু বলল— টিকটিকির মতো কারা?

ডমরু বলল— মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখি আর আমরা।

তোমাদের এলাকায় বিভিন্ন প্রাণী দেখো। তারপর নীচের খোপগুলি ভরে ফেলো।

প্রাণীর নাম	কোথায় থাকে	গায়ের রং	আঁশ আছে কিনা	পায়ের সংখ্যা	ডানার সংখ্যা	লেজ আছে কিনা	কী খায়

পাশাপাশি দুটি প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে। এদের একটা মিল ও একটা অমিল লেখো।

মিল	অমিল

মিল	অমিল

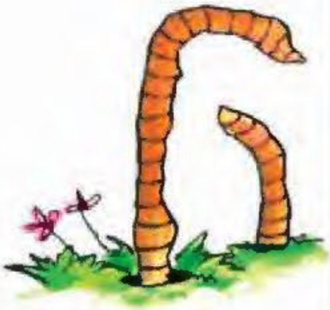

মিল	অমিল

মিল	অমিল

নানা প্রাণীর নানা রূপ

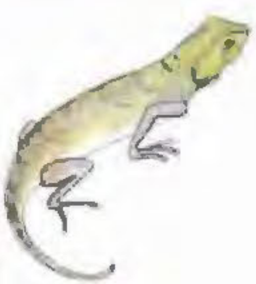

গিরগিটিটা পাঁচিলের ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছিল। কিছু দিন আগে টিপাই এই গিরগিটিটাকে দেখেছিল জবা গাছের ডালে। কেমন ছাইরঙা। আজ কিন্তু ও ভালো করে দেখতে পায়নি। বেশ খয়েরি রঙা। পাঁচিলের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। পথে বুম্বার সঙ্গে দেখা। বুম্বাকে টিপাই গিরগিটির কথা বলল।

বুম্বা বলল— জানিস সেদিন আমাদের বাড়ির গাছে একটা সাপ দেখেছিলাম। পুরো সবুজ রঙের। আমি তো প্রথমে দেখতে পাইনি। হঠাৎ কী একটা নড়ছে দেখলাম। তারপর বুঝলাম ওটা সাপ।

পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে এসব কথা বলল।

দিদিমণি বললেন— বাঃ, তোমরা তো বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের রং ভালো লক্ষ করেছ। অনেক প্রাণীরাই রং বদলে বা বিশেষ রং ধারণ করে বাঁচার চেষ্টা করে। যাতে অন্য প্রাণী বা মানুষ এসে মেরে না দেয়।

রীতা বলল— দিদি শজারুর গায়ে কাঁটা কেন?

বুম্বা বলল— যাতে ওদের কেউ ধরতে না পারে?

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ।

টিপাই বলল— তাহলে গোরুর শিং?

ডমরু বলে উঠল— কেউ মারতে গেলেই গুঁতিয়ে দেবে। সবাই হেসে উঠল। দিদিমণি বললেন— বাঘের ডোরাকাটা দাগ, হাতির শুঁড় ও দাঁত, ভালুকের থাবায় নখ সবই নিজেকে বাঁচানোর জন্য।

শজারুর কাঁটা

গোরুর শিং

হাতির শুঁড়

তোমরা এবার দলে মিলে নীচের কাজটা করে ফেলো। তোমাদের এলাকার প্রাণীগুলোকে দেখো। শিংওলা, নখওলা, চারপাশের গাছপালার সঙ্গে রং মিলিয়ে চলা প্রাণীদের নাম নীচের তালিকায় লেখো।

কী ধরনের প্রাণী	প্রাণীদের নাম
১। শিংওলা প্রাণী	
২। ধারালো নখওয়ালা প্রাণী	
৩। গাছপালার রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে চলা প্রাণী	

জলজ প্রাণীর কথা

রুই মাছ

শিঙি মাছ

চিংড়ি

কাঁকড়া

জলে থাকে মাছ। মাছেরাও নানারকমের। নানা নামও রয়েছে। কারোর নাম রুই, কাতলা। কারোর নাম কই, শিঙি। কারোর নাম বোয়াল, তো কারোর নাম ন্যাদোস। সবাই জলে থাকে। জলে সবাই সাঁতরে চলে। তাই রয়েছে পাখনা। নানা ধরনের পাখনা। আর রয়েছে আঁশ। সারা শরীরজুড়ে। আঁশগুলো বেশ শক্তপোক্ত। বাইরের আঘাত থেকে বাঁচায়। শিঙি, মাগুরের কাঁটা বেশ সুঁচালো। শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়। জলে শুধুই কী মাছ। জলে থাকে কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক, কচ্ছপ, কুমির কত কী। কাঁকড়ার দাঁড়াগুলো বেশ খাঁজকাটা। শামুকের মতো নরম শরীরটা শক্ত খোলসে ঢাকা, কচ্ছপেরও তাই। হাঁস কিন্তু পাখি। জল ছাড়া থাকতেই পারে না। সাঁতার কাটার জন্য পায়ের আঙুলগুলো জোড়া।

ব্যাং

শামুক

ঝিনুক

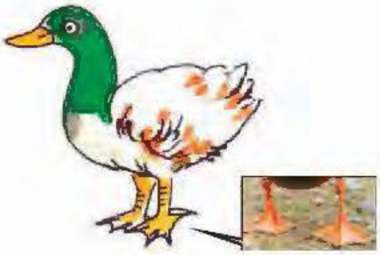
হাঁস

এবার তোমরা জলের প্রাণীগুলোকে দেখো। জলে থাকার জন্য তারা কোন কোন অঙ্গ কীভাবে ব্যবহার করে তা লেখো।

প্রাণীর নাম	অঙ্গের নাম	তাদের কাজ
১। চিংড়ি		
২। শামুক		
৩। কাঁকড়া		
৪। রুই মাছ		

পাখির মতো উড়ব

রন্তু রোজ সন্ধ্যাবেলা পাখিদের বাসায় ফেরা দেখে। ভীষণ ইচ্ছে ওর পাখির মতো ওড়ার। তাহলে যখন খুশি, যেখানে খুশি যাওয়া যাবে। ও হাত দুটোকে দু-পাশে বাড়ায়। পাখির মতো নাড়তে থাকে। কিন্তু উড়তেই পারে না। ওর তো আর পালক নেই। ডানাও নেই। আর শরীর বেশ ভারী। উড়বে কী করে? ডালে বসে থাকার জন্য পাখিদের আঙুলের নখগুলো বেশ সুঁচালো। কিন্তু রন্তুর আঙুলের নখগুলো সুঁচালো নয়। রন্তু বেশি ছুটলে হাঁপিয়ে যায়। অথচ, পাখিরা তো অতক্ষণ আকাশে ওড়ে তাও ক্লান্ত হয় না। পাখিদের শরীরের ভেতরে বাতাস ভরা থলি আছে। তারা সেই থলিতে অনেকটা বাতাস একবারে ভরে নেয়। আর আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

চড়াই

ধনেশ

টুনটুনি

পেঁচা

শালিক

কাঠঠোকরা

তোমরা ছবির পাখিগুলোকে দেখে নীচের কাজটি করে ফেলো।

পাখির নাম	ডানার রং	ঠোঁট লম্বা না ছোটো/সরু না মোটা	কী খায়
১। চড়াই			
২। ধনেশ			
৩। টুনটুনি			
৪। পেঁচা			
৫। শালিক			
৬। কাঠঠোকরা			

হারিয়ে যাচ্ছে বাঘ

সেদিন সকালে রেডিয়োতে খবর শুনেছে টুকুন— বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে আরও অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্কুলে এসে স্যারকে জিজ্ঞেস করল— বাঘ কেন বিলুপ্ত হবে?

স্যার বললেন — মানুষ জঙ্গল সব কেটে ফেলছে। বাঘের থাকার জায়গা কমে যাচ্ছে। জঙ্গলে হরিণ, শুয়োর এসব কমে যাচ্ছে। বাঘ খাবে কী? আবার চোরাশিকারিরা বাঘের চামড়া- নখ-হাড় এসবের লোভে বাঘ মেরে ফেলছে। ফলে বাঘের সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে যে সবাই মনে করছে, একটা বাঘও আর পৃথিবীতে থাকবে না। তখন বলা হবে যে বাঘ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেটা যাতে না হয় তার জন্য সরকারের বনবিভাগ এবং আরও অনেকে খুব চেষ্টা করছে।

সুমিরা জিজ্ঞাসা করল—বাঘ ছাড়া আর কোনো প্রাণী কি বিলুপ্ত হতে পারে?

— নিশ্চয়। গন্ডার, বুনো মোষ, নানা ধরনের বাঁদর, পাখি, সাপ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাই ওইসব প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

টুকুন বলল— সংরক্ষণ কী?

স্যার বললেন— যে যে কারণে জীবটার সংখ্যা কমে যায় সেইসব কারণগুলো যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা- তাকেই বলে সংরক্ষণ। যেমন– বনজঙ্গল না কাটা, সেখানে প্রাণীদের খাবার ও তেষ্টার জল যাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তার ব্যবস্থা করা, চোরাশিকারিরা যেন তাদের মারতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা।

রতন বলল— আমার দাদু যে বলেন, সোনা ব্যাং এত কমে গেছে এখন, বিলুপ্ত-ই হয়ে যাবে হয়তো। সোনা ব্যাঙেরও কি সংরক্ষণ দরকার?

স্যার বললেন— অবশ্যই। যে-কোনো প্রাণী এমনকি উদ্ভিদ যদি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়, তবে তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

আনন্দ বলল—মশা, ইঁদুর এদেরও কি সংরক্ষণ করা দরকার?

স্যার মুচকি হেসে বললেন— কেন, তোমাদের এলাকায় কি ওরা খুব কমে গেছে? ওদের জন্য তোমার এত চিন্তা।

সবাই হেসে উঠল।

বন্যেরা বনেই সুন্দর তাই না? জঙ্গলে নানা গাছপালার সমাহার। তারই মধ্যে কতরকম জন্তু। সবাই মহানন্দে থাকে। কেউ গাছের ওপরে থাকে । কেউ বা নীচে। বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিকার করে। কেউ গাছের ফলমূল খায়। এভাবেই চলে তাদের জঙ্গলজীবন। এমন সময় যদি আমরা জঙ্গালের গাছপালা কাটি, নিজেদের বাড়ি বানাই, জঙ্গল সাফ করি— তাহলে ওরা থাকবে কোথায়? আমরা মাংসের জন্য যদি হরিণ, বুনোশুয়োর শিকার করি, তাহলে ওদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারা যাবে কোথায়? আজকাল প্রায়ই শুনি সুন্দরবনের বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। তাই মাঝে মাঝেই বন দফতরের ডাক পড়ে। তারা এসে বাঘকে উদ্ধার করে। গভীর জঙ্গালে ছেড়ে দিয়ে আসে।

মরিশাসের ডোডো আজ আর নেই

মরিশাস, ভারত মহাসাগরের বুকে একটি ছোট্ট দ্বীপ। প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। তখনও মানুষের এত বসবাস গড়ে ওঠেনি। সেখানে নানা পশু-পাখি মহানন্দে ছিল। তার মধ্যে হাঁসের মতো দেখতে একরকমের পাখি ছিল। নাম ছিল ডোডো। হঠাৎ বিদেশি জাহাজ এসে ভিড়ল। এল প্রচুর মানুষ। তার সঙ্গে এল প্রচুর বিড়াল, ইঁদুর, কুকুর, বানরের দল। শুরু হলো ডোডো মারার পালা। আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল তারা।

নীচের পশু-পাখিগুলিও হারিয়ে যাওয়ার পথে। তাদের বাঁচানো খুবই দরকার। তোমরা দলে মিলে আলোচনা করে তাদের হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলি লেখো। তাদের বাঁচাবেই বা কী করে?

১। চড়ুই ২। শকুন ৩। গোসাপ ৪। ব্যাং ৫। বাঘ

হারিয়ে গেছে যারা

বালিদ্বীপের বাঘ

হিমালয়ের বামন তিতির

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের কচ্ছপ

ভারতের গোলাপি মাথা হাঁস

নিউজিল্যান্ডের গ্রেলিং মাছ

আমাদের চোখের সামনে কতরকম প্রাণী। এর বাইরেও রয়েছে আরও অনেক প্রাণী। অনেক প্রাণী আবার হারিয়েও গেছে। তাদের হারিয়ে যাওয়ার কারণও রয়েছে। যেসব প্রাণী হারিয়ে গেছে তারা হলো বিলুপ্ত প্রাণী। তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সেসব আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। আমাদের চারপাশেও এমন বেশ কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমরা যদি সচেতন না হই তারাও হারিয়ে যাবে একদিন। তারা এখন ভীষণ বিপন্ন।

হারিয়ে যেতে চলেছে যারা

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

অলিভ রিডলে কচ্ছপ

একশৃঙ্গ গন্ডার

কৃষ্ণসার হরিণ

আমাদের চোখের সামনে কত গাছপালা, কত প্রাণী। একসময় আরও ছিল। হারিয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আবার কতই না নতুন নতুন প্রাণ জন্ম নিয়েছে। আমাদের চারপাশে তারা রয়েছে। তাদেরকে চেনা দরকার। না চিনলে আমরা তাদের বাঁচাব কী করে। আর তারা না বাঁচলে আমরাও থাকব না। তোমরা তো তোমাদের অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের চিনেছ। এবার চলো আরো কিছু বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরকে চিনি, জানি। তবেই না আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গাছপালা আর প্রাণীদের সম্বন্ধে জানব। তবে এব্যাপারে বাড়ির বড়োদের সাহায্য নিতে ভুলো না ।

এবার তোমরা তোমাদের এলাকায় যে যে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রচুর পরিমাণে আছে, নীচের তালিকায় তাদের নামের পাশে টিক দাও। তাছাড়াও আরও কিছু বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদ তোমাদের এলাকায় থাকতে পারে। তাদের নামও লিখে ফেলো।

উদ্ভিদের নাম	টিক দাও	প্রাণীদের নাম	টিক দাও
১। বট		১। কেঁচো	
২। পাইন		২। কাঁকড়া	
৩। গরান		৩। ধনেশ পাখি	
৪। বনতুলসী		৪। বেঁজি	
৫। লিচু		৫। বাবুই	
৬। বাবলা		৬। ভাম	
৭। নয়নতারা		৭। মাছরাঙা	
৮। জিওল		৮। বাঘ	
৯। বাঁশ		৯। ডাকপাখি	
১০। ফণীমনসা		১০। গোসাপ	
১১। অর্জুন		১১। ভোঁদড়	
১২। আকন্দ		১২। চামচিকে	
১৩। খেজুরগাছ		১৩। বনরুই	
১৪। বাবুই ঘাস		১৪। গাঙচিল	
১৫। আম		১৫। বনমোরগ	
১৬। বেতগাছ		১৬। শকুন	
১৭। পিয়ালগাছ		১৭। কাঠঠোকরা	
১৮। কাঁকড়াগাছ		১৮। বোরোলি মাছ	
১৯। কেনগাছ		১৯। ঘুঘু	
২০। অনন্তমূল		২০। ন্যাদোস মাছ	

সব কিছুর জন্য জায়গা লাগে

অরুণ , আফতাব , রাজেশ , সিধু , আর রুকসানা - সকলেরই ইচ্ছে ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসবে। তাই নিয়ে সমস্যা শুরু। যদিও বা বসার জায়গা হলো, বইখাতা ব্যাগ রাখার আর জায়গা হচ্ছে না। এমন সময় দিদিমণি এসে বললেন—তোমাদের অসুবিধেটা কী শুনি?

অরুণ বলল — দিদি, আমাদের বইখাতা রাখতে পাচ্ছি না।

রুকসানা বলল — তুমি পেছনের বেঞ্চিতে চলে যাও, কাল এখানে বসবে। দিদিমণির দিকে তাকিয়ে অরুণ পরের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। ক্লাস শান্ত হলে দিদিমণি বললেন—তোমরা জায়গার কথা বলছিলে না? আচ্ছা তোমাদের একজনের স্কুলব্যাগে যা যা জিনিস আছে বার করো। এই টেবিলটাতে পাশাপাশি রাখো সেসব।

দিদিমণি বললেন — টেবিল বা টেবিলের ওপর বা আমাদের চারপাশে যা যা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা **বস্তু** বলি। বস্তু যা দিয়ে তৈরি তাকে আমরা **পদার্থ** বলি। যেমন ধরো প্লাস্টিকের বোতল বা লোহার পেরেক হলো বস্তু কিন্তু প্লাস্টিক বা লোহা হলো পদার্থ।

তোমার চেনা কয়েকটি বস্তুর নাম লেখো ও ছবি আঁকো। সেগুলো কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বস্তুর নাম	ছবি আঁকো	কী পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়

দিদিমণি বললেন — অরুণ , বইখাতা রাখার পরে টেবিলের ওপরে কাঠের পুরো অংশটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?

অরুণ বলল — না দিদি ; একটু একটু দেখা যাচ্ছে। বাকিটা দেখতে পাচ্ছি না।

— পাচ্ছ না কেন?

অরুণ বলল — ওই যে বইখাতাগুলো সব রাখতে জায়গা লেগেছে।

— আচ্ছা , আফতাব বলো তো তুমি যেখানে বসে আছ সেখান থেকে তোমাকে না সরিয়ে কেউ কি বসতে পারবে?

আফতাব বলল — না , দিদি , বসবে কী করে? বসতে তো জায়গা চাই।

— রুকসানা , এই জলভরতি বোতলে আর কি জল রাখা যাবে?

রুকসানা বলল — কী করে ধরবে দিদি, ওতে তো আর জায়গাই নেই!

— সিধু , তুমি কখনও ফুঁ দিয়ে বেলুন ফুলিয়েছ?

সিধু বলল — হ্যাঁ, দিদি , কতবার! বেলুন ফোলাতে আমার খুব মজা লাগে।

— বেলুনের প্যাকেটে অনেক বেলুন থাকে , না ? আচ্ছা , বেলুনের প্যাকেটে কটা ফোলানো বেলুন রাখা যাবে বলো তো?

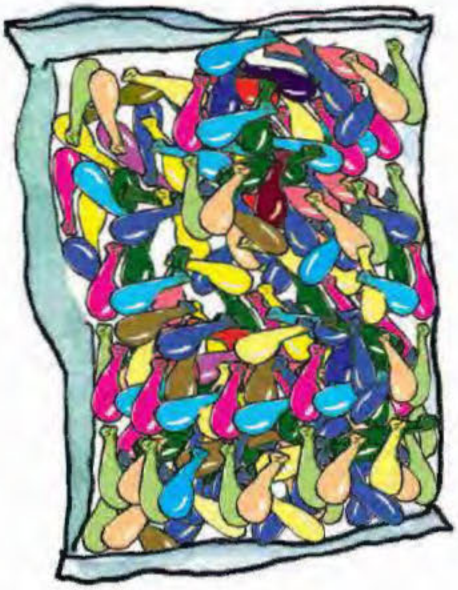

সিধু বলল — একটাও না! ছোট্ট প্যাকেটে অত বড়ো বেলুন ধরে না কি?

—তাহলে তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলে — বই খাতা রাখতে জায়গা লাগে, জল রাখতে জায়গা লাগে, এমনকী ফোলানো বেলুনও কিছুটা জায়গা নেয়।

১) নীচের ছবির মতো একটা গ্লাস বসাও। জল ঢেলে গ্লাসটা কানায় কানায় ভরতি করো। এবার গ্লাসে তোমার আঙুল ডোবাও।

কী করলে ?	কী দেখলে ?	কেন এমন হলো ?

২) একটা থালায় এক মুঠো শুকনো বালি নাও। পাশের ছবির মতো একটা গ্লাস বসাও। জল ঢেলে গ্লাসটা কানায় কানায় ভরতি করো। এবারে ওই জলভরতি গ্লাসে একটু একটু করে বালি দিতে থাকো।

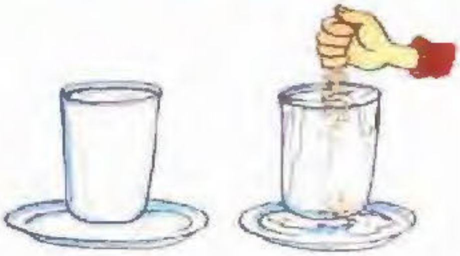

কী দেখতে পাবে	কেন এমন হলো

তাহলে বালির এক একটা দানা খুব ছোট্ট হলেও সকলে মিলে তারা বেশ খানিকটা জায়গা নেয়।

নীচের কবিতার অংশটুকু পড়ে তোমার কী মনে হয় বলত?

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা,
বিন্দু বিন্দু জল —
গড়ি তোলে মহাদেশ,
সাগর অতল।'

কেউবা কঠিন, কেউবা তরল, কেউবা গ্যাস

পরের দিন দিদিমণি এসে প্রশ্ন করলেন—আফতাব, কাল মাঠের ধারে লোকটি কী বিক্রি করছিল বলোতো?

আফতাব বলল — গ্যাস বেলুন দিদি ; বড়ো লাল রঙের বেলুনটা কী ভালো, আমার খুব কিনতে ইচ্ছে করছিল ....

দিদিমণি বললেন — আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। এখন তুমি বলোতো বেলুনের মধ্যে কী থাকে?

আফতাব বলল — একরকমের গ্যাস, তবে কী গ্যাস জানি না।

— রাজেশ, যদি বেলুন ফেটে যায় গ্যাসটা কোথায় যায়?

রাজেশ বলল — বেলুন ফাটলে গ্যাস কী আর থাকবে, সে তো ছড়িয়ে যায়। চোখে অবশ্য দেখা যায় না।

— ঠিক বলেছ গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা আর কেউ কোনো গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণ দিতে পারো?

রুকসানা বলল — আমি দেখেছি ; মশা মারার জন্য ধোঁয়া দেয় সেটা ছড়িয়ে পড়ে, বুকে গেলে কাশি হয়।

রাজেশ বলল— ধূপের ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়াও তো ছড়িয়ে পড়ে।

অরুণ বলল— নর্দমায় ব্লিচিং পাউডার দিলে কী একটা গ্যাস বেরোয়, নাক-চোখ খুব জ্বালা করে।

— তোমরা সকলেই ঠিক বলেছ। ধোঁয়ার মধ্যে অনেকরকম গ্যাস মিশে থাকে, খানিকটা গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিসও থেকে যায় অনেক সময়। আমাদের সবচেয়ে চেনা জিনিস কী বলত যা ছাড়া আমরা বাঁচব না? তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সে যখন এসে গাছের পাতা দুলিয়ে দেয় তখন বুঝি সে এসেছে।

সিধু বলল— হাওয়া।

— ঠিক বলেছ। হাওয়ায় অনেক রকম গ্যাস মিশে থাকে। তাহলে তোমরা জানো যে গ্যাসকে খোলা জায়গায় ধরে রাখা যায় না, তারা ছড়িয়ে পড়ে। আচ্ছা , সিধু তোমার বোতলের জলটা যদি একটা মগে ঢেলে দিই ....

সিধু বলল — আমাদের তিনরকম দেখতে তিনটি মগ আছে। তার কোনটায় দেবেন ?

দিদিমণি বললেন — সেটার কথা হচ্ছে না। বলছি কোনো একটা মগে যদি ঢেলে দিই তাহলে কী জলটা বোতলের মতো দেখাবে?

সিধু বলল — তা হয় না কি? বোতলের জল বোতলের মতো, মগের জল মগের মতো।

— তার মানে তুমি বলছ এক এক রকমের পাত্রে জলকে এক এক রকম আকারের দেখাবে?

সিধু বলল— হ্যাঁ, তাই।

— জলের বদলে দুধ, সরষের তেল, ডিজেল, পেট্রোল বা কেরোসিন নিলেও কি তাদের পাত্রের মতোই দেখাবে ?

অরুণ বলল— হ্যাঁ, তা তো হবেই, ওরা যে গড়িয়ে যেতে পারে।

— খুব দরকারি কথা 'গড়িয়ে যেতে পারে'।

রাজেশ বলল– ইট রেখে দিলে যেমন দেখতে ছিল তেমনি থাকে, জলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

— ঠিক বলেছ ইট, কাঠ, লোহা, বালি, মাটি, প্লাস্টিক, কাচ এদের সব নিজস্ব নিজস্ব আকার আছে। এদের আমরা বলি কঠিন।

তাহলে বোঝা গেল যে কঠিন , তরল, গ্যাস — এদের মধ্যে কঠিনের নিজস্ব আকার আছে; তরল আর গ্যাসের নিজস্ব কোনো আকার নেই।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

তিনটি কঠিন পদার্থের উদাহরণ	তিনটি তরল পদার্থের উদাহরণ

কে বেশি ছড়িয়ে পড়তে চায় আলোচনা করে লেখো।

তরল না গ্যাস	
কঠিন না তরল	

কোনো কিছু ভারী, কোনো কিছু হালকা কেন ?

দিদিমণি এসে বললেন— আফতাব তুমি স্কুলের বইভরতি ব্যাগ, পেনসিল বাক্স আর জলের বোতলের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আর সবচেয়ে ভারী জিনিস খুঁজে বার করো তো।

আফতাব বলল— দিদি, সবচেয়ে ভারী হলো স্কুলের বইভরতি ব্যাগ, আর সবচেয়ে হালকা হলো পেনসিল বাক্সটা।

— হাতে ধরে তুমি মোটামুটি ধারণা করেছ যে কিছু জিনিস বেশি ভারী আর কিছু জিনিস কম ভারী। কিন্তু আরো ভালো করে বুঝতে চাইলে তুমি কী করবে?

রুকসানা বলল— দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা দিয়ে মেপে দেখব।

— ঠিকই বলেছ। যদি তুমি দেখো দাঁড়িপাল্লার একদিকে যে কোন একটা বাটখারা চাপিয়ে অন্যদিকে জলভরতি বোতলটা রাখলে পাল্লাদুটো যদি কোনোদিকে হেলে না থাকে তাহলে বুঝবে দুটোই সমান ভারী। যে জিনিস যত ভারী তার ভর তত বেশি। বাটখারা দিয়ে কোনো জিনিসের ভর মাপা হয়।

সিধু বলল— দিদি জলভরতি বোতল খালি বোতলের চেয়ে ভারী। তার মানে কি জলেরও ভর আছে?

— হ্যাঁ, শুধু জল কেন, যে-কোনো কঠিন বা , যে-কোনো তরলের একটা ভর আছে।

এসো দাঁড়িপাল্লা তৈরি করি : একটা একহাত লম্বা লাঠি নাও। লাঠির ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো করে তাতে দড়ি বাঁধো। দুটো সমান মাপের, সমান ওজনের ঢাকনা, বা ছোটো প্লাস্টিকের থালা নিয়ে সমান মাপের দড়ি দিয়ে ছবির মতো করে ঝুলিয়ে দাও। মাঝের দড়িটা ধরে দেখো দু-দিক সমান থাকছে কিনা।

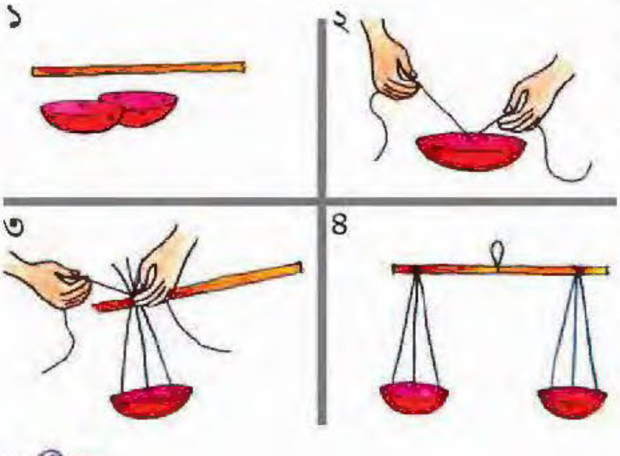

এক মগ শুকনো বালি আর একটা চামচ জোগাড় করো। এবার তোমার দাঁড়িপাল্লার একদিকে একটা পেন চাপাও। চামচে করে বালি নিয়ে অন্য দিকের পাল্লায় দিতে থাকো। তোমার তো বাটখারা নেই, তার কাজটা করবে বালি। যতটুকু বালি দেবার পর পাল্লা দুটো সমান সমান হবে ততটুকু বালির ভর হলো ওই পেনটার ভরের সমান। একইভাবে লুডোর ছক্কা, একটা তালা, একটা পাঁচ টাকার কয়েন এসবের ভরও মেপে দেখো।

রাজেশ বলল — দিদি , গ্যাসেরও কী ভর আছে? আমার তো তা মনে হয় না?

— হ্যাঁ, গ্যাসেরও ভর আছে। তোমার হাতে-ধরা বেলুনে যতটা গ্যাস ধরে , বা গাল ফোলালে যতটুকু গ্যাস মুখের মধ্যে থাকে তাদের ভর খুবই কম। তাই তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু তুমি কি গ্যাসের উনুনে রান্না হতে দেখেছ? গ্যাস সিলিন্ডার থেকে পাইপে করে উনুনে গ্যাস যায়, আগুন জ্বালালে পোড়ে। রান্না হতে থাকলে সিলিন্ডার ক্রমশ হালকা হতে থাকে। দেখোনি, বাড়িতে যিনি গ্যাস সিলিন্ডার দেন তাঁর ওটা আনতে কত কষ্ট হয়? কিন্তু নিয়ে যাবার সময় তিনি কত সহজেই সিলিন্ডারটা নিয়ে যান। তার মানে কী?

অরুণ বলল— রোজ রোজ গ্যাস পুড়ে যাচ্ছে বলে সিলিন্ডারের ভর কমছে।

— হ্যাঁ, তাহলে বোঝা গেল যে গ্যাসেরও ভর আছে। আচ্ছা একটা ছোটো বালির দানা, তারও কি কিছু ভর আছে? নিশ্চয়ই আছে, নইলে এক বস্তা বালি অত ভারী হয় কেন? বস্তায় অনেক বালির দানা থাকে। তাহলে বোঝা গেল কঠিন, তরল, গ্যাস সবারই ভর আছে আর প্রত্যেকেই কিছুটা জায়গা নেয়।

যার কিছুটা ভর আছে, যে কিছুটা জায়গা নেয় তাকে আমরা পদার্থ (ম্যাটার, matter) বলি। কঠিন, তরল আর গ্যাস হলো পদার্থের তিনটি অবস্থা।

বরফ গলে জল হলো, জল বাষ্প হলো

আফতাবের বাবার মাছের ব্যাবসা। আফতাব দেখেছে বরফের মধ্যে করে মাছ আসে। বাবা বলেছেন বরফে রাখলে মাছ সহজে নষ্ট হয় না। সিধুর আবার বরফের গুঁড়ো নিয়ে ডেলা তৈরি করে লোফালুফি করতে ভালো লাগে। দুজনেরই একটা সমস্যা — বরফ তাড়াতাড়ি গলে জল হতে থাকে। ক্লাসে গিয়ে দুজনেই অবাক : দিদিমণি একটা কাচের গ্লাসে করে বরফ এনে টেবিলে রাখলেন।

অরুণ বলল— দিদি, বরফ এনেছেন কেন? বরফ দিয়ে কী হবে?

— বরফ এনেছি তোমাদের দেখাব বলে। আচ্ছা দেখো তো বরফের ওপরটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ?

রুকসানা বলল— হ্যাঁ দিদি, বরফ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আফতাব বলল— আমিও দেখেছি, কিন্তু ওতে ধোঁয়ার গন্ধ নেই। ওটা ধোঁয়া নয়।

— ঠিক বলেছ আফতাব, ওটা ধোঁয়া নয়। ওটা কি আমি তোমাদের বলব? কিন্তু সিধু, তুমি বলতো গ্লাসের গায়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা?

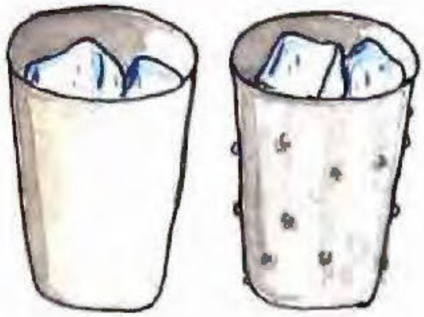

সিধু বলল — হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্লাসের বাইরে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। জল কোত্থেকে এল?

— হাওয়া একটা গ্যাসীয় মিশ্রণ, ওতে অনেক গ্যাস আছে। তা ছাড়াও হাওয়ায় জলীয় বাষ্প থাকে। খুব ঠান্ডা হলে সেই জলীয় বাষ্প থেকে জলের ফোঁটা তৈরি হয়। গ্লাসের বাইরের জলের ফোঁটাগুলো সেইভাবেই তৈরি হয়েছে।

রাজেশ বলল— কিন্তু ওই ধোঁয়ার মতো জিনিসটা কী?

— হাওয়ায় থাকা ওই জলীয় বাষ্পই ঠান্ডা বরফের সংস্পর্শে খুব ছোটো ছোটো জলকণা তৈরি করেছে। যখন জলকণাগুলো হাওয়ায় ভাসছে তখন তাদের গায়ে লেগে আলো ঠিকরোচ্ছে। ওই ছোটো ছোটো জলকণাগুলো যেহেতু দল বেঁধে রয়েছে, তাই ওটা সাদা ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে।

রুকসানা বলল— তাহলে গ্লাস থেকে আরেকটু উঁচুতে সাদা দেখাচ্ছে না কেন?

— খুব ছোটো ছোটো জলকণারা তাড়াতাড়ি উবে গিয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। তখন আর তাদের দেখা যায় না। আচ্ছা, যদি এই গ্লাসসুদ্ধ বরফটা একঘন্টা এখানে রেখে দিই, গ্লাসের মধ্যে কি তখনও বরফই পড়ে থাকবে?

সিধু বলল— না, না, সব বরফ গলে জল হয়ে যাবে।

— তাহলে আমরা তখন যে জলটা পাব তাকে যদি উনুনে ফোটাই, কী হবে?

অরুণ বলল— সাদা ধোঁয়ার মতো ভাপ বেরোবে আর জলটা উবে যাবে। ভাপ বলে কেন দিদি?

— ঠিক , এখানে জল ফুটে জলীয় বাষ্প তৈরি হবে। 'বাষ্প' কথাটা থেকেই 'ভাপ' কথাটা এসেছে। তাহলে তোমরা দেখলে জলের তিনরকম অবস্থা হয় — জল যখন কঠিন তখন তাকে আমরা বলি বরফ। বরফ গলে হয় তরল জল। আবার তরল জল ফোটালে পাওয়া যায় জলীয় বাষ্প। বরফ থেকে জল, বা জল থেকে বাষ্প, বা বাষ্প থেকে জল এসব হলো জলের অবস্থার পরিবর্তন।

নীচের প্রশ্নগুলো নিয়ে তোমরা আলোচনা করো, প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও :

(১) রোদ্দুরে যখন ভিজে গামছা রাখা হয়, গামছা শুকিয়ে যায়। জলটা কোথায় যায়?

(২) শীতকালে ঘাসে যে শিশির জমে তা আসে কোথা থেকে?

(৩) জল ছাড়া আর কী কী জিনিস ঠান্ডা করলে জমে যেতে দেখেছ?

(৪) শীতকালে নারকেল তেলের শিশিতে তেল জমে কঠিন হয়ে গেছে। কী করে শিশির মধ্যে কিছু না ঢুকিয়ে তুমি তেল বার করে মাথায় মাখবে?

(৫) সুতির জামা ইস্ত্রি করার সময় কাপড়ে একটু জল ছিটিয়ে রাখা হয়। এবার এই অল্প ভিজে কাপড়ে গরম ইস্ত্রি ঘষলে কী হতে দেখবে?

প্রকৃতিতে জলের অবস্থার পরিবর্তন:

সূর্যের তাপে সমুদ্র-নদী-পুকুর থেকে জল বাষ্প হয়। বাতাসে জলীয় বাষ্প মিশে মাটি থেকে উঁচুতে ওঠে এবং ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হতে হতে একসময় ছোটো ছোটো জলের ফোঁটা সৃষ্টি হয়। এই জলের ফোঁটা দিয়েই মেঘ তৈরি হয়। কখনো কখনো সেই জল আরো ঠান্ডা হয়ে বরফের টুকরোও তৈরি করে। কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এই বরফের টুকরোগুলো যখন এসে পড়ে আমরা বলি 'শিল পড়ছে'। '*শিলা*' মানে পাথর। যদিও ওগুলো পাথর নয়, তবুও কঠিন তো বটেই। ওই শিলা থেকেই শিল কথাটা এসেছে।

কত কী মিশে আছে

রোজকার জীবনে আমরা অনেক সময়েই নানারকম জিনিস মিশে থাকতে দেখি। যেমন ধরো চাল আর কাঁকর মিশে থাকে, জলে নুন বা চিনি গুললে তারা মিশে যায়। তোমরা দেখেছ মুড়িতে মুড়ির গুঁড়ো মিশে থাকে, বালি, সিমেন্ট আর জল দিয়ে সিমেন্ট মাখা হয়। একের বেশি রকমের জিনিস মিশে গেলে আমরা বলি মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। অনেকসময় আবার মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো আলাদা করার দরকার হয়। কী করে মিশ্রণের উপাদানগুলো আলাদা করে তা জানা যাক।

(১) হাতে করে আলাদা করা

দিদিমণি বললেন— তোমরা চাল থেকে কাঁকর আলাদা করতে দেখেছ?

রেশমা বলল— হ্যাঁ দিদি, কুলোয় নিয়ে ঝেড়ে চাল থেকে কাঁকরগুলো বেছে ফেলে দিলেই হলো।

— ঠিক বলেছ। এভাবে আলাদা করা কখন সম্ভব জানো? যদি প্রত্যেকটা জিনিস খালি চোখে দেখা আর হাতে করে ধরা যায়।

(২) হাওয়ার সাহায্যে আলাদা করা:

— তোমরা কেউ চাল থেকে ধানের খোসা আলাদা করতে দেখেছ? ধানের খোসাকে বলে 'তুষ', জানো তো?

অরুণ বলল— আমি দেখেছি দিদি। মাঠে নিয়ে গিয়ে যেখানে হাওয়া দিচ্ছে সেখানে দাঁড়াতে হবে। তারপর তুষসুদ্ধ ধান হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে থাকলে তা আলাদা হয়ে যাবে।

— হ্যাঁ, ধানের চেয়ে তুষ হালকা, তাই হাওয়ায় তুষটা ভেসে গিয়ে একটু দূরে পড়ে।

(৩) ছাঁকনি নিয়ে কাজ :

দিদিমণি এবার একটা ছাঁকনি তুলে দেখালেন। বললেন—এটা দিয়ে কী করা যায় বলোতো?"

সিধু বলল— চা ছাঁকা যায়। ছাঁকনির ফুটো দিয়ে চা বেরিয়ে যায়, পাতাগুলো ওপরে আটকে যায়।

— আচ্ছা যদি মুড়ি থেকে মুড়ির গুঁড়ো আলাদা করতে চাই তাহলে কী করতে হবে? এই চা ছাঁকনি দিয়ে হবে?

আফতাব বলল— ছাঁকনির ফুটোগুলো বড্ড ছোটো, মুড়ির গুঁড়োগুলো আটকে যাবে।

রুকসানা বলল— একটা চালুনি আনলেই হয়ে যাবে। চালুনিতে রেখে ঝাড়লেই গুঁড়োগুলো চালুনির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

— তাহলে আমরা বুঝলাম যে ছাঁকনি আর চালুনির কাজ একই। দুটো ক্ষেত্রেই একই নীতিতে আলাদা করার কাজটা করা হচ্ছে।

নিজেরা আলোচনা করো :

এক গ্লাস জলে এক চামচ নুন গুলে নেওয়া হলো। এই নুন জল থেকে ছাঁকনি দিয়ে কি জল আর নুনকে আলাদা করা যাবে?

(৪) থিতিয়ে ফেলে আলাদা করা :

দিদিমণি রাজেশকে বললেন "তোমার মা কী করে চাল ধুয়ে নেন দেখেছ?"

রাজেশ বলল—চালটা নিয়ে একটু জল দিয়ে হাতে করে নাড়িয়ে নেয়, তারপর ওপরের জলটা ঢেলে ফেলে দেয়।

– হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এতে হালকা ধুলো জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। চালের দানা ভারী বলে তলায় থিতিয়ে পড়ে।

নদীর জলে ভাসমান সূক্ষ্ম বালিমাটি থিতিয়ে পড়ে নদী ক্রমশ বুজে আসে।

বন্যার পরে যে পলিমাটি থিতিয়ে পড়ে, সেই পলিমাটি চাষের পক্ষে খুব উপযোগী।

(৫) মিশ্রণ থেকে বাষ্প করে তরলকে সরিয়ে ফেলা :

দিদিমণি এসে অরুণকে ডেকে বললেন— তুমি এই বাটিতে একটু জল ঢালো। এতে দু-চামচ নুনকে চামচের সাহায্যে গুলে দাও। এটা কী তৈরি হলো?

অরুণ বলল— নুনজল তৈরি হলো দিদি।

– এই নুনজলটা যদি একটা থালায় ফেলে দুপুরের রোদে রেখে দিই, দু-দিন পরে কী দেখতে পাব?

রাজেশ বলল— আমি বলব দিদি? জলটা উবে যাবে, নুনটা পড়ে থাকবে।

— তুমি কী করে জানলে?

রাজেশ বলল — আমরা দিঘায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে সমুদ্রের জলে ভেজা কালো প্যান্ট না কেচে রোদে রেখেছিলাম। প্যান্টটা শুকোনোর পরে তাতে সাদা সাদা কেমন দাগ হয়ে গিয়েছিল। মা বলেছে ওটা সমুদ্রের জলের নুন।

— কী করে বুঝলে ওটা নুনই, বালি নয়?

রাজেশ বলল— ওটা যে জলে গুলে যায়, বালি তো জলে গোলে না।

আফতাব বলল— দিদি, তাহলে সমুদ্রের জল থেকে কি নুন তৈরি করা যাবে?

– হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সমুদ্রের জল থেকে এইভাবে নুন তৈরি করা কত সোজা। একসময় ভারতে এভাবে নুন তৈরি করত লোকেরা। পরে বৃটিশ শাসকরা নুন তৈরি করতে বাধা দিয়েছিল। তারা নুনের ওপর চড়া কর বসিয়ে দিয়েছিল। নুন সমস্ত মানুষ ব্যবহার করেন। নুনে কর বসালে সবারই অসুবিধা হবে। তাই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে লবণ কর না দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর নেতৃত্বে সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করেছিলেন সাধারণ মানুষ।

খাবার কোথা থেকে পাই

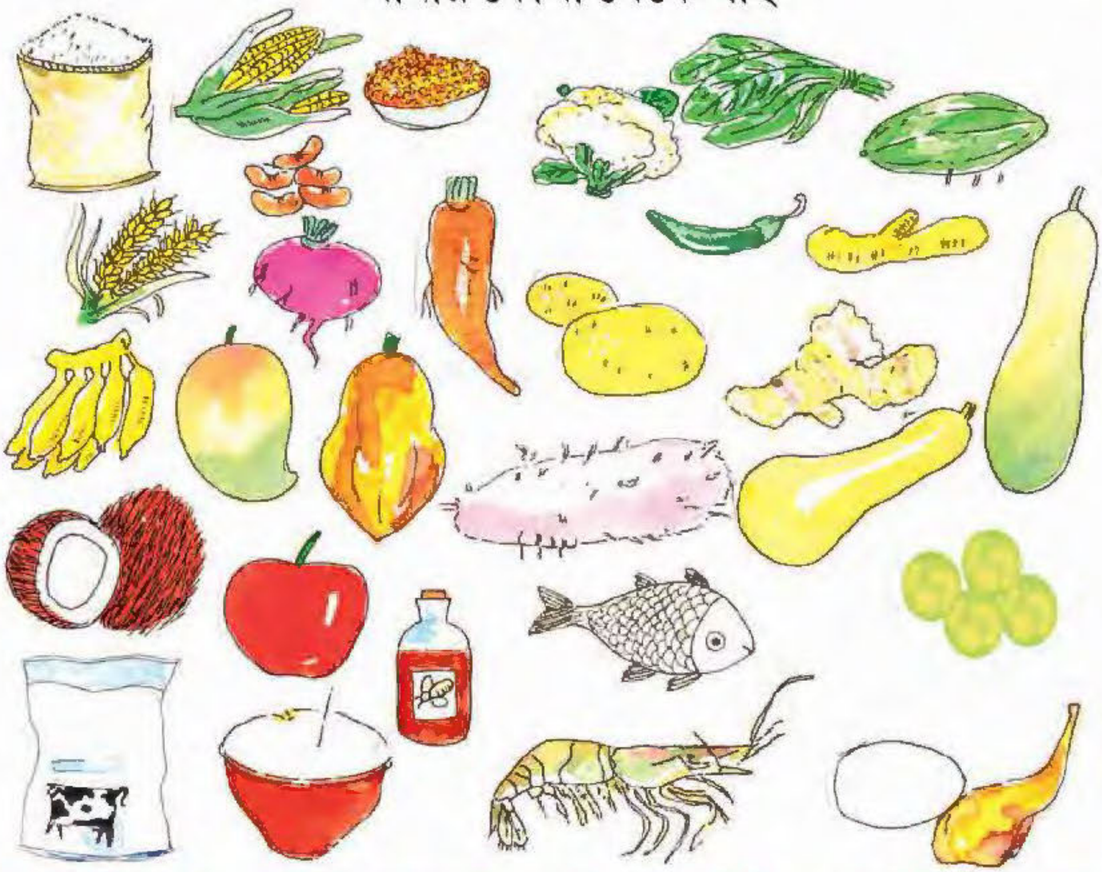

ওপরে খাবার তৈরির উপকরণের কিছু ছবি দেওয়া আছে। এগুলো থেকে কী কী খাবার তৈরি হতে পারে, বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

এমন কিছু যা সরাসরি খাওয়া যায়	যে যে খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে বানানো হয়

ওপরের ছবিগুলোর সাহায্যে তোমাদের প্রতিদিনের একটা খাদ্যতালিকা তৈরি করো।

সকালে কী খাও	দুপুরে কী খাও	বিকালে কী খাও	রাতে কী খাও

ছবিতে দেওয়া উপকরণগুলো থেকে তৈরি খাবার ছাড়াও তোমার এলাকায় আর অন্য কোনোরকম খাবারের কথা জানা থাকলে সেই খাবারের নাম আর উপকরণের নাম লেখো ।

খাবারের নাম	উপকরণের নাম

প্যাকেট করা নানা খাবার

এবার নীচের ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ করো।

নানা স্বাদের তৈরি খাবার আর প্যাকেট করা তৈরি খাবারের কথা তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। তোমার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় এই ধরনের কোন কোন খাবার থাকে সেটা লেখো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করো এই খাবারগুলো প্রায়ই খেলে শরীরের কী কী অসুবিধে হতে পারে ।

তোমার জানা খাবারের নাম	কবে তৈরি	কতদিন অবধি খাওয়া যাবে

প্যাকেট করা তৈরি খাবার প্রায়ই খেলে শরীরের কী কী অসুবিধে হতে পারে ?

১. পেটের গোলমাল
২.
৩.
৪.

না-মানুষের নানা খাবার

দিদিমণি প্রশ্ন করলেন—হাতি আর মশার খাবারের চাহিদা কি একই? গোরু আর কুকুর কি একই খাবার খায় ?

সহেলি বলল—টিভিতে দেখেছি হাতি কলাগাছ ভেঙে মুড়িয়ে খাচ্ছে।

আসমা বলল—গোরু তো ঘাস খায়। খড়, বিচালিও খায়।

যিশু বলল—প্রজাপতি ফুলের রস খায়।

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, সব প্রাণীদের খাওয়ার ধরন কি একইরকম ?

অরুণ বলল—কুকুর তো দাঁত দিয়ে কামড়ে খায়।

সহেলি বলল—আমাদের বাড়িতে পোষা টিয়া আছে। টিয়াকে দেখেছি ঠোঁট দিয়ে ফল ঠুকরে খায়। মুখে কিন্তু দাঁত নেই দিদি।

সব শুনে দিদিমণি বললেন—সব প্রাণীদের আবার দাঁত থাকে না। তাই সব প্রাণীদের খাওয়ার ধরনও একরকম নয়। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়।

যিশু-সহেলিরা স্কুলে দিদিমণির সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণীদের খাবার নিয়ে আলোচনা করল।

তোমরাও তোমাদের চারপাশের বিভিন্ন প্রাণীরা কী খায়, আর কেমনভাবেই বা খায় সেই বিষয়ে নীচে লেখো। এই বিষয়ে তোমার জানা অন্য প্রাণীদের কথাও নীচে লেখো।

প্রাণীর নাম	কী খায়	কীভাবে খায়
১. মৌমাছি	১. ফুলের রস	১. চুষে খায়
২. ঘাসফড়িং	২.	২.
৩. কেঁচো	৩.	৩.
৪. উকুন	৪.	৪.
৫. ব্যাং	৫.	৫.
৬. সাপ	৬.	৬.
৭. পায়রা	৭.	৭.
৮. বিড়াল	৮.	৮.
৯.	৯.	৯.
১০.	১০.	১০.

দাঁতের যত্ন

আসমা বন্ধুদের বলল- মা-র কয়েকদিন ধরে দাঁতে খুব ব্যথা। মা-র সঙ্গে কালকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। মা-র দাঁত নাকি খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু মাকে দাঁতে একটা ওষুধ লাগাতে দিলেন। আর ওষুধও খেতে দিলেন। আর দাঁত ভালো রাখতে দিনে দু-বার দাঁত মাজতে বললেন।

সুস্থ দাঁতের ভেতরটা কেমন

যিশু শুনে বলল—আমি তো দিনে দু-বার দাঁত মাজি না। আমারও দাঁত খারাপ হয়ে যাবে নাকি?

আসমা বলল—দু-বার করেই দাঁত মাজবি এখন থেকে। আমিও তাই করব।

সহেলি বলল—আজ স্কুলে গিয়ে দিদিমণিকে দাঁতের কথা জিজ্ঞেস করব।

ক্লাসে সহেলি দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করল—দিদি, আসমা বলছিল দিনে দু-বার দাঁত না মাজলে দাঁত নাকি খারাপ হয়ে যায়?

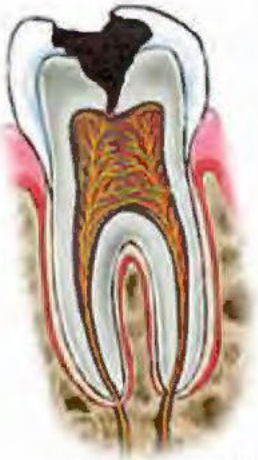

খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁতের ভেতরটা কেমন

দিদিমণি বললেন—শুধু দিনে দু-বার দাঁত মাজলেই হবে না। কোনো কিছু খাওয়ার পরেও ভালো করে মুখ ধুয়ে নিও। না হলে দাঁত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তখন আবার দাঁত তুলে ফেলতে হতে পারে। আসমা, তুমি এত কিছু জানলে কী করে?

আসমা বলল—মায়ের সঙ্গে আমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। ওখানে আমি গোটা দাঁতের ছবিতে দেখেছি। কত বড়ো দাঁত! সেখানে আবার একটা খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁতের ছবিও ছিল।

— আসলে দাঁতের বেশিরভাগ অংশটাই মাড়ির ভেতরে থাকে। খুব অল্প অংশই মাড়ির বাইরে থাকে। জানো কি, মাড়ির বাইরে থাকা দাঁতের অংশটাই হলো শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশ।

আসমা জিজ্ঞেস করল—দাঁত খারাপ হয় কেন দিদি?

— খাবার খাওয়ার সময় দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো আটকে যেতে পারে। আর ওই খাবারের টুকরোয় বাসা বাঁধে খালি চোখে দেখা যায় না এমন সব জীব। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারে বাসা বাঁধা জীবেরাই দাঁতকে খারাপ করে দেয়।

দাঁতের যত্ন

১. আমাদের দাঁত মাজা দরকার কেন? ....

....

২. দাঁত কখন এবং কীভাবে মাজা দরকার ?

....

....

৪. দাঁতের ফাঁকে খাবার আটকে থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে ?

....

তোমার বা তোমার বন্ধুদের কারোর কি কখনও দাঁতের সমস্যা হয়েছে? বন্ধু এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো। দাঁতের অন্যরকম কোনো সমস্যার কথা জানা থাকলে সেটাও লেখো।

দাঁতের সমস্যা	কেন এমন হয়েছে	কী করা দরকার	সমস্যার সমাধান না করলে কী হতে পারে
দাঁতে ব্যথা			
মাড়ি থেকে রক্ত পড়া			
মাড়ি ফুলে যাওয়া			

দাঁত নিয়ে নানা কথা

অরুণ জিজ্ঞেস করল —খারাপ হয়ে যাওয়া দাঁত তো তুলে ফেলতে হয় দিদি। তাতেই বা ক্ষতি কী ! আমাদের মুখে তো অনেক দাঁত থাকে। তার একটা দুটো তুলে ফেললে কী ক্ষতি?

আসমা বলল— তাহলে আমরা খাবার চিবোব কী করে?

— ঠিকই বলেছ। কিন্তু চিবোনো ছাড়াও দাঁতের আরো নানারকম কাজ আছে। আর আমাদের মুখে অনেক দাঁত আছে ঠিকই। কিন্তু সব দাঁত একরকম নয়। আবার তাদের কাজও নানারকম।

তুমি আর তোমার বন্ধুরা তো নানাধরনের খাবার খাও। দেখোতো নীচে যে খাবারগুলোর নাম দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা কীভাবে খাও? তোমার ইচ্ছামতো আরো কিছু খাবারের নাম যোগ করতে পারো।

খাবারের নাম	কীভাবে খাও
১. বাদাম	১. দাঁত দিয়ে ভেঙে
২. মাংস	২. দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে
৩. চিনির দানা/মিছরি	৩. দাঁত দিয়ে গুঁড়িয়ে
৪. পাঁউরুটি	৪. দাঁত দিয়ে কেটে
৫. ভুট্টার দানা	৫.
৬. বিস্কুট	৬.
৭. পাটালি গুড়	৭.
৮. খোসাসুদ্ধ আম	৮.

দিদিমণি বললেন— দাঁত তাহলে কতরকমের কাজ করে ?

অরুণ বলল— চাররকমের দিদি, কাটা, ছেঁড়া, ভাঙা আর গুঁড়ো করা। তাহলে দাঁতও কি চার রকমের?

— ঠিক বলেছ। আমাদের মুখে চার ধরনের দাঁতই থাকে। ছবি থেকে ওদের চিনে নাও। গুনে দেখোতো মুখে কতগুলো দাঁত আছে।

এবারে একটা কথা বলোতো, জন্মের সময় একটা বাচ্চার মুখে কি দাঁত থাকে ?

সহেলি বলল- কয়েকদিন আগে আমার কাকিমার মেয়ে হয়েছে। কই তার মুখে তো কোনো দাঁত দেখিনি।

— ঠিকই। জন্মের পরে প্রথম দিকে দাঁত থাকে না। জন্মের সাধারণত ছয় মাস পর থেকে দাঁত উঠতে আরম্ভ করে।

যিশু বলল—আমার তো আবার কিছু দাঁত পড়ে গেছে। আবার কিছু দাঁত নতুন করে উঠছে।

— আসলে প্রথম যে দাঁতগুলো ওঠে সেগুলো সারাজীবন থাকে না। এগুলোকে বলে দুধের দাঁত। সাধারণত ছয় বছর থেকে বারো বছর বয়স অবধি এই দাঁতগুলো থাকে। ছবি দেখে এইরকম দাঁত কতগুলো থাকে গুনে দেখত।

তোমার বাড়ির বা আশেপাশের বাড়ির সদ্য জন্মানো বা একটু বেড়ে ওঠা শিশুকে লক্ষ করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক /শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

১. জন্মের সময় চোয়ালে কী দাঁত থাকে? ....

২. জন্মানোর কত মাস বয়স পর থেকে দাঁত গজাতে শুরু করে?

....

৩. আর ওই শিশু তিন বছর বয়সে পৌঁছোলে এই দাঁতের সংখ্যা হয়- .... (২০/৩২/৪২/৪৮)

৪. কত বছর বয়সে পৌঁছোলে দুধের দাঁত পড়ে যায়? ....

৫. তারপর যে নতুন দাঁত গজাতে শুরু করে সেগুলো কি সারাজীবন থেকে যায়? ....

তোমার দাঁত ওঠা ও দাঁত পড়ে যাওয়া নিয়ে যে যে অভিজ্ঞতা আছে তা লিখে ফেলো।

খাবার হজম হলো

অরুণ বলল— আমি তো খুব তাড়াতাড়ি খাই। মা বলেন, আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে। তবেই নাকি খাবার হজম হবে। সত্যি দিদি?

দিদিমণি বললেন— তোমার মা ঠিকই বলেন। দাঁত দিয়ে আমরা খাবারকে কী করি বলোতো?

আসমা বলল— দাঁত দিয়ে তো আমরা খাবারকে ভেঙে টুকরো করি।

— বাঃ, ঠিক বলেছ। খাবারকে ভেঙে টুকরো করাই হলো হজমের প্রথম ধাপ। দাঁত দিয়ে খাবার চিবোনোর সময় আর কী হয় বলত?

সহেলি বলল— খাবারটা নরম হয়ে দলা পাকিয়ে যায়।

— ঠিক বলেছ। আমাদের মুখের আশেপাশে থাকে কয়েকটা লালাগ্রন্থি। লালাগ্রন্থি থেকে বেরোয় লালারস। লালারসে থাকে হজমের রস। হজম করানো ছাড়াও লালারস খাবারকে দলা পাকিয়ে দেয়। যাতে খাবার সহজেই গলা দিয়ে নেমে যায়।

অরুণ জিজ্ঞেস করল—হজম মানে কী দিদি?

— হজম মানে হলো খাবারকে খুব ছোটো ছোটো কণায় ভেঙে ফেলা। যাতে খাবারের ওই কণাগুলো শরীর খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারে।

এর মধ্যেই স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। যিশুর খুব তাড়া। দৌড়, দৌড়। খেলার মাঠ ডাকছে। মাঠে বল নিয়ে ঈশান, অরুণ, রহমান, রবিনরা অপেক্ষা করছে। এদিকে মা খেতে দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছে আর স্কুলে আজ কী কী হলো সেই গল্প বলছে মাকে। এইসব করতে গিয়ে যিশু হঠাৎ জোরে জোরে কাশতে আরম্ভ করল। মা যিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে

লাগলেন। বললেন—আস্তে আস্তে খেতে পারিস না। সবসময় তাড়াহুড়ো। খেতে খেতে কথা বলছিস। দেখ তো কেমন বিষম লাগল!

পরদিন ক্লাসে যিশু জিজ্ঞেস করল—আমাদের বিষম কেন লাগে দিদি?

দিদিমণি বললেন— আসলে আমাদের গলার ভেতরে পাশাপাশি দুটো নল আছে। একটা নল দিয়ে খাবার যায়। আর একটা নল দিয়ে বাতাস যায়। খাওয়ার সময় কথা বললে কখনো-কখনো খাবারের টুকরো ভুল পথে ওই বাতাস যাওয়ার নলে ঢুকে পড়তে পারে। তখন শরীর চায় বাতাস যাওয়ার নলটা থেকে ওই খাবারের টুকরোটাকে বার করে দিতে। না হলেই বিপদ।

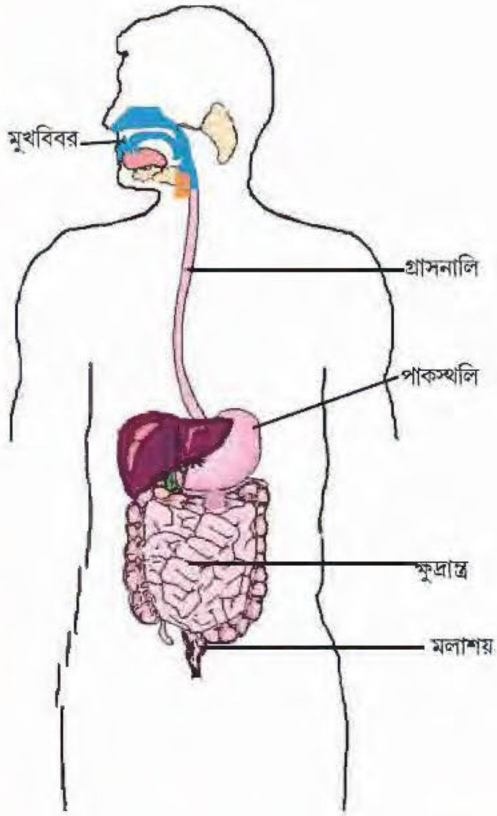

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল - কী বিপদ দিদি?

— বাতাস যাওয়ার নলে খাবারের টুকরো ঢুকে গেলে বাতাস তো আর যেতে পারবে না। তখন আমাদের দম আটকে আসবে। কিন্তু আর একটা নল দিয়ে কী যায় বলত?

রবিন বলে উঠল, দিদি খাবার যায় কি?

— বাঃ, ঠিক বলছ। ওই নল দিয়ে খাবার নীচের দিকে নেমে যায়।

রহমান জিজ্ঞেস করল—নীচে নেমে খাবার কোথায় যায় দিদি?

— ওই নলের শেষে একটা থলির মতো অংশ আছে। তার নাম পাকস্থলি। খাবার এরপর পাকস্থলিতে চলে আসে। এখানে খাবারের কিছুটা অংশ হজম হয়।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—তারপর খাবার কোথায় যায় দিদি?

— এরপর আরো নীচে নেমে খাবার পৌঁছোয় বড়ো প্যাঁচালো নলের মতো একটা অংশে। এর নাম অন্ত্র। অন্ত্রের একটা অংশে খাবারের বাকিটা হজম হয়। এটা ক্ষুদ্রান্ত্র। খাবারের যে অংশটা হজম হয় না তা মল হিসাবে মলাশয়ে কিছুক্ষণ জমা থাকে। তারপর শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

খাবারের দলা নল দিয়ে নীচে নেমে আসে। পাকস্থলিতে পৌঁছোয়। তারপর হজমের রসের সঙ্গে মিশে খাবার আরও ছোটো কণায় পরিণত হয়।

পাকস্থলি থেকে খাবারের কণা অন্ত্রে আসে। এখানে নানারকম হজমের রসের সাহায্যে খাবারের কণাগুলো আরো ছোটো হয়। খাবারের কণাগুলো ছোটো হতে হতে শরীরে মিশে যাবার মতন হয়।

নীচের দুটো ছবি ভালো করে দেখো। তারপর দলে আলোচনা করো। বাঁদিকে খাবারের ছোটো ছোটো টুকরোতে ভেঙে যাওয়ার ছবি দেওয়া হয়েছে। ডানদিকে মানুষের শরীরের ছবি দেওয়া হয়েছে। মানুষের শরীরের যে যে অংশে ওই কাজগুলো হয় তার সঙ্গে মেলাও। ফাঁকা বাক্সতে ওই অংশগুলোর নাম লেখো।

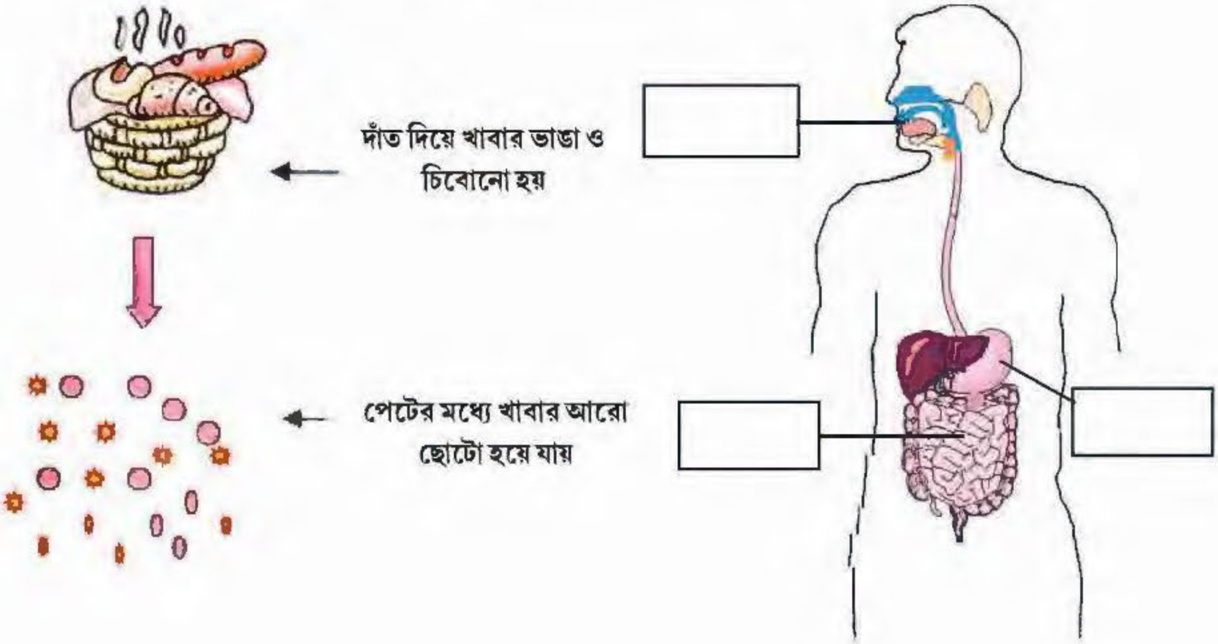

যদি তোমার খাবার ঠিকমতো হজম না হয় বা দীর্ঘসময় ধরে মল দেহ থেকে না বেরোয় তবে কী কী সমস্যা হতে পারে?

অসুখ থেকে বাঁচতে খাবার

আনিসুরচাচা অনেকদিন পর পালানদের বাড়িতে এলেন। পালানের বাবা জিজ্ঞেস করলেন - কী ব্যাপার আনিসুর, এতদিন আসনি কেন?

আনিসুর বললেন—খুব জ্বরে ভুগলাম কদিন। তারপর থেকে খাবারে অরুচি। বেশ দুর্বল লাগছে। পালানের বাবা বললেন তোমাকে তো বারবার বলতাম ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে। এত পরিশ্রম করলে কি আর শরীর থাকবে! সময়মতো খাবার খেলে শরীরটা এত দুর্বল হতো না। ডাক্তার কী বলেছেন?

— ডাক্তারবাবু বলেছেন, দীর্ঘদিন সময়মতো খাওয়াদাওয়া না করায় শরীর খারাপ হয়েছে। সময়মতো ঠিকঠাক আর পরিমাণমতো খাবার খেলে শরীর ভালো হয়ে যাবে।

পালান ভাবল, ঠিকঠাক খাবার মানে কী? স্কুলে গিয়ে দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

পরদিন ক্লাসে এসব নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। পালানের কথা শুনে দিদিমণি বললেন—হাতি আর মশার কি খাবারের চাহিদা একই? গোরু আর বাছুর কি একই খাবার খায়? শরীর-এর চাহিদা অনুযায়ী খাবার খেতে হয়। তবে এমন খাবারই খেতে হবে যা শরীরকে সুস্থ রাখবে। যে খাবার খেলে আমাদের শরীরের আকার ও ওজন বাড়বে। তবে সময়মতো খাবার খাওয়াও দরকার।

পিয়ালী বলল- দিদি, মা বলছিলেন ঠিকমতো খাবার না খেলে নাকি রাতে চোখে দেখতে অসুবিধা হয়?

দিদিমণি বললেন - হ্যাঁ ঠিকই তো। শাকসবজি, গাজর, পাকা পেঁপে এসব খাওয়া চোখের পক্ষে ভালো। এছাড়াও টক জাতীয় ফল যেমন লেবু যারা খায়, তাদের দাঁত আর মাড়ি খুব সুস্থ থাকে।

আনিসুর বলল — দিদি আমার ভাই একদম দুধ, মাছ এসব খেতে চায় না।

— সেকি কথা! ভাইকে বোঝাবে দুধ, মাছ, ডিম, ডাল, সয়াবিন এসব খেতে হয়। না হলে ও খুব রুগ্ন হয়ে যাবে।

তোমরা এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখোতো খাবার ঠিকমতো না খেলে এইরকম আর কী কী সমস্যা আসতে পারে। প্রয়োজনে তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

ঠিক মতো খাবার না খেলে যে ধরনের সমস্যা হতে পারে	কী ধরনের খাবার খেলে এই সমস্যা এড়ানো যায়

খাবার খেয়ে কী পাই ?

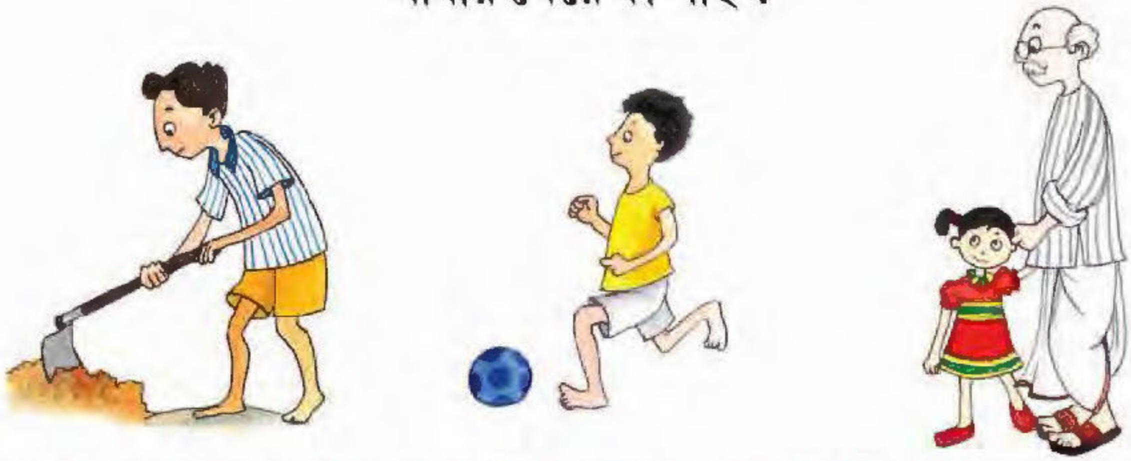

খেলতে, দৌড়োতে অথবা কাজ করতে তোমার কী লাগে? খাবার থেকে আমরা কী পাই যা পেলে আমরা ওপরের ছবিতে দেখানো কাজগুলো করতে পারি? ....

ফাঁকা বাক্সে কী শব্দ বসবে ভেবে লেখোতো।

খাবার	→	শক্তি	→	

কাজ করার জন্য .... প্রয়োজন হয়।

কাজ করার জন্য চাই খাবার

দিদিমণি বললেন— আমরা সবাই তো সারাদিন নানারকম কাজ করি। তোমরা স্কুলে আসো, খেলাধুলা করো,পড়াশোনা করো - এসবও তো কাজ। সারাদিনে তোমরা কী কী কাজ করো তার একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করো।

তোমরা সারাদিন কী কী কাজ করো এবং কখন করো সেটা নীচে লেখো।

কী কাজ করো	কখন করো

দিদিমণি এবারে জিজ্ঞেস করলেন—যদি আমরা সারাদিন কিছু না খাই, তাহলে আমাদের গায়ের জোর কি কমে যাবে ?

মঞ্জু বলল - গায়ের জোর পুরোপুরি হয়তো কমে যাবে না। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ব।

— আমরা তো সারাদিন এতসব কাজ করি। সেই কাজ করার শক্তি পাই কোথা থেকে ?

আসলাম বলল— আমরা তো খাবার খাই। খাবার থেকেই শক্তি পাই।

দিদিমণি বললেন- ঠিক বলেছ। তবে এক এক রকম কাজের জন্য এক এক পরিমাণ শক্তি দরকার।

যে-কোনো কাজ করতে শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো কাজে শক্তি লাগে বেশি। আবার কোনোটায় শক্তির প্রয়োজন হয় কম। খাবার খেয়ে আমরা সেই শক্তির চাহিদা মেটাই।

নীচের প্রাণীগুলোর ছবি লক্ষ করো। ছবির নীচে লেখো কে কোন কাজের ভঙ্গিতে রয়েছে :

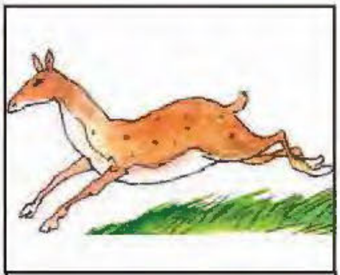

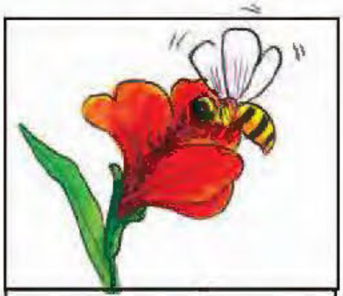

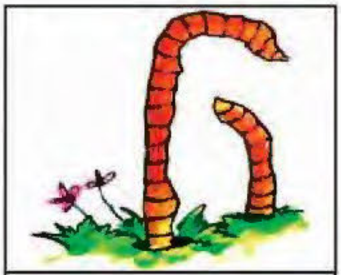

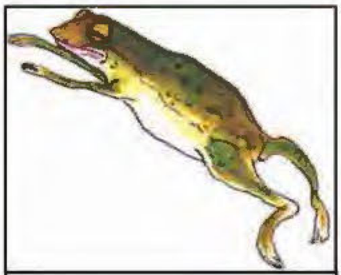

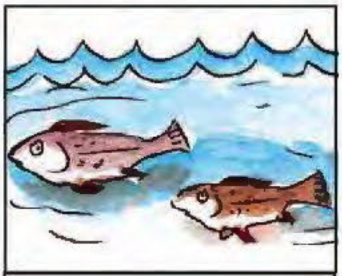

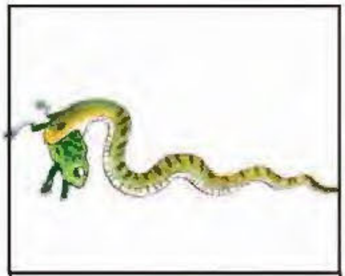

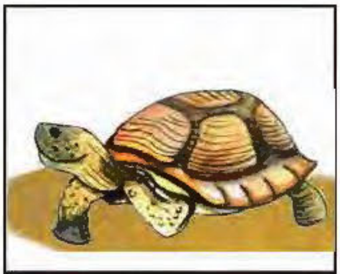

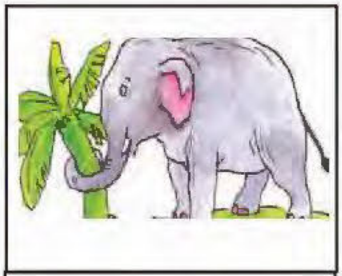

যে খাবার খেয়ে সুস্থ থাকব

যিশু জিজ্ঞেস করল—আমাদের সবার কি একইরকমের খাবারের দরকার হয় ?

দিদি বললেন — না। আমরা সবাই তো একই ধরনের কাজ করি না। কোনোটায় অনেক বেশি পরিশ্রম, কোনোটায় একটু কম। কাজ অনুযায়ী শক্তির চাহিদাও বদলায়। শক্তির চাহিদা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার খাবার খাওয়ার ধরন আর পরিমাণও বদলায়।

সহেলি জিজ্ঞেস করল —তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব কোন কোন খাবার খেতে হবে?

—আসলে আমাদের নানারকম খাবার মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে হয়। বিভিন্ন ধরনের খাবার সঠিকভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয়। যাতে শরীরের শক্তির চাহিদা মেটে, সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারি আর রোগ প্রতিরোধও করতে পারি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিদিন সবধরনের খাবার পরিমাণ মতো মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়া- এটাই সুষম আহার।

যিশু জিজ্ঞেস করল - সব মানুষের সুষম আহার কি একই রকমের?

— প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে সুষম আহার একই রকমের হয় না। কাজের ধরন অনুযায়ী সুষম আহার পালটে যায়। শুধু তাই নয় সুষম আহার কেমন হবে, তা নির্ভর করে বয়স, শরীরের ওজন, উচ্চতা, কোনো জায়গার জলহাওয়ার মতো বিষয়ের ওপরেও।

সহেলি জিজ্ঞেস করল— সুষম খাবারের মধ্যে কী কী ধরনের খাবার থাকে দিদি?

— সুষম খাবারের মধ্যে মূলত চার ধরনের খাবার থাকে। এই চার ধরনের খাবারের নাম নীচের তালিকায় দেওয়া আছে। তোমার অঞ্চলের পরিচিত খাবারগুলোকে নীচের নির্দিষ্ট ঘরে লেখো।

দানাশস্যজাতীয় খাবার	শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাবার	তেল, ঘি, বাদামজাতীয় খাবার	মাছ, মাংস, ডিমজাতীয় খাবার
১. ভাত	১. কুমড়ো শাক	১. ঘি	১. মাছ
২. রুটি	২. পেয়ারা	২. বাদাম	২.
৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.
৬.	৬.	৬.	৬.
৭.	৭	৭.	৭.
৮.	৮.	৮.	৮.

আচ্ছা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার মানুষেরা কী ধরনের খাবার খেত? বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

দানাশস্যজাতীয় খাবার	শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাবার	তেল, ঘি, বাদামজাতীয় খাবার	মাছ, মাংস, ডিমজাতীয় খাবার

খাবার পাই কোথা থেকে ?

আমরা কোন কোন খাবার উদ্ভিদ থেকে পাই, আর কোন খাবারই বা প্রাণীদের থেকে পাই তা নীচে লিখে ফেলো।

খাবারের নাম	উদ্ভিদ থেকে পাই	প্রাণী থেকে পাই	তোমার বাড়িতে কে কোনটা খায়

এবারে এসো আমরা জানার চেষ্টা করি কোন কোন খাবার থেকে বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষ শক্তি পায়।

জীবের নাম	কোন কোন খাবার থেকে শক্তি পায়	জীবের নাম	কোন কোন খাবার থেকে শক্তি পায়
১. গোরু	১.	৬. কচ্ছপ	৬.
২. হাতি	২.	৭. সাপ	৭.
৩. বাঘ	৩.	৮. ব্যাং	৮.
৪. মাছ	৪.	৯. মাছরাঙা	৯.
৫. হরিণ	৫.	১০. মানুষ	১০.

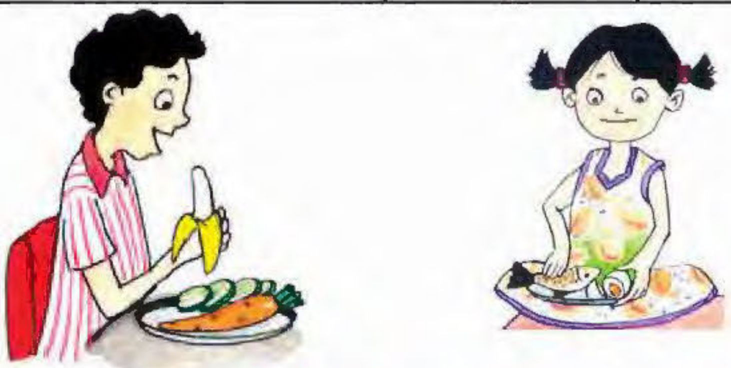

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন— মানুষ আর বিভিন্ন প্রাণী কোন ধরনের খাবার থেকে শক্তি পায় ?

আসলাম বলল— উদ্ভিদ থেকে।

অরুণ বলল— কেন, প্রাণীদের থেকেও তো পাই। দুধ, ডিম।

— তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ। আচ্ছা দুধ বা ডিম আমরা কোন প্রাণী থেকে পাই ?

অরুণ বলল, দুধ পাই গোরু ও ছাগল থেকে। আর ডিম দেয় মুরগি।

— বেশ। বলতে পারবে কি গোরু, ছাগল আর মুরগি কী খায় ?

শামিম বলল— গোরু তো ঘাস খায়।

অরুণ বলল — ছাগলও তো ঘাস খায়, গাছের পাতাও খায়।

মঞ্জু বলল— মুরগি তো চাল, গম এইসব খায়।

অরুণরা আলোচনা করুক। আর সেই ফাঁকে তোমরা কয়েকটা প্রাণীর নাম লিখে ফেলো যাদের থেকে আমরা বিভিন্ন খাবার পাই। আর ওই প্রাণীরা কী কী খায় সেটাও লেখার চেষ্টা করোতো।

প্রাণীর নাম	আমরা কী খাবার পাই	ওই প্রাণী নিজে কী খায়	কোথা থেকে পায় (উদ্ভিদ/প্রাণী)
১. গোরু	১.	১.	১.
২. ছাগল	২.	২.	২.
৩. মুরগি	৩.	৩.	৩.
৪. হাঁস	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.

গাছের খাবার তৈরি

দিদিমণি বললেন — প্রাণী থেকে আমরা বেশ কিছু খাবার পাই। আচ্ছা তাহলে ওই প্রাণীরা খাবার পায় কোথা থেকে বলো দেখি?

আসমা বলল— গাছ থেকে দিদি।

—ওই প্রাণীদের কাছ থেকে আমরা যে খাবার পাই, তার মূলে আছে গাছেরা। তাহলে সব খাবারের মূলে কারা?

শামিম বলল— সব খাবারই আমরা পাই আসলে গাছদের থেকে।

— ঠিক বলেছ। সরাসরি বা ঘুরপথে উদ্ভিদেরাই হলো আমাদের সব খাবারের উৎস। উদ্ভিদেরা খাবার পায় কোথা থেকে বলো দেখি?

মঞ্জু বলল— দিদি, মাটি থেকে পায় কি ?

— মাটি থেকে তৈরি খাবার পায় না। কিন্তু মাটি থেকে জল আর খাবার তৈরির কিছু দরকারি উপাদান পায়। বাতাসের একটা উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সে বাতাস থেকে টেনে নেয়। খাবার তৈরি করতে আর লাগে সূর্যের আলো।

শামিম জিজ্ঞেস করল—গাছ কোথায় খাবার তৈরি করে দিদি?

— গাছ তার শরীরের সবুজ অংশগুলোতে খাবার তৈরি করে। খাবার তৈরি করার সময় তৈরি হওয়া অক্সিজেন গ্যাস সে বাতাসে মিশিয়ে দেয়। তৈরি হওয়া খাবারের কিছুটা গাছ নিজে ব্যবহার করে। আর বাকিটা গাছ জমিয়ে রাখে নিজের শরীরে। আসলে সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির একটা অংশই উদ্ভিদের তৈরি খাবারে জমা থাকে। এবারে ছবির ফাঁকা বাক্স দুটো ভরতি করে ফেলো।

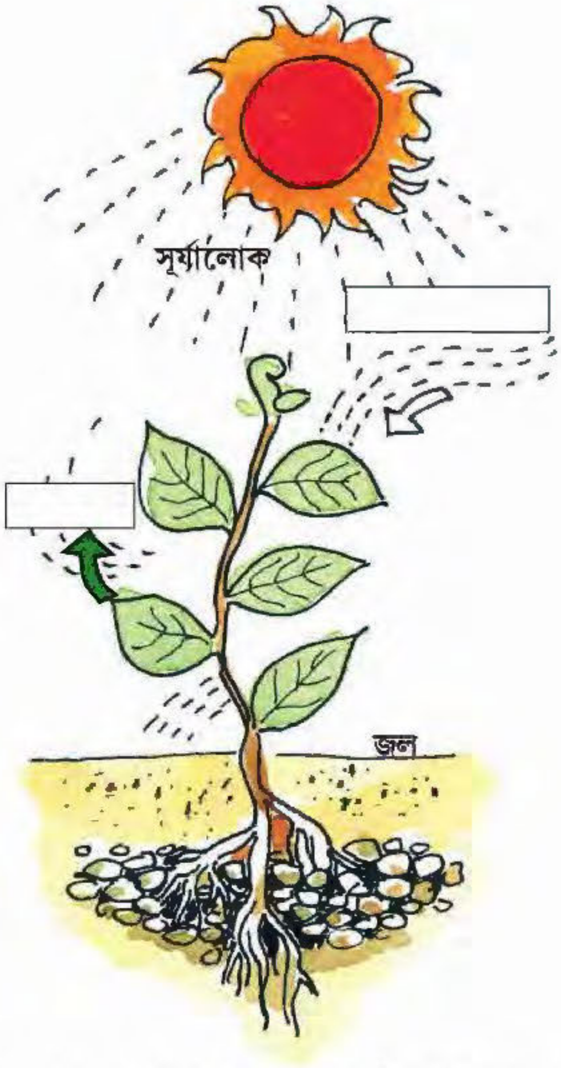

শামিম বলল—তার মানে সূর্যের শক্তি জমা থাকে উদ্ভিদের তৈরি করা খাবারে। আর খাবার খেলে সেই শক্তিই আসে প্রাণীদের দেহে।

— ঠিক তাই। তারপর দরকার মতো সেই শক্তিই প্রাণীরা ব্যবহার করে। মাছরাঙা আর চিল ছোঁ মেরে মাছ শিকার করে, বাঘ হরিণ শিকার করে, মৌমাছি ফুলের মধু খুঁজে বেড়ায়, মাছ সাঁতার কাটে। আর মানুষ দিনরাত কতরকম কাজেই না এই শক্তি খরচ করে।

মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীরা কীভাবে উদ্ভিদদের ওপর নির্ভর করে, তার একটা ছবি তোমাদের খাতায় আঁকো।

খাবার থেকে শক্তি পাই কীভাবে

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেছে। দিদিমণি নিশ্চয়ই ক্লাসে এসে গেছেন। শামিম, মঞ্জু আর মেরি তাড়াতাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল। ক্লাসে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে তারা হাঁপাতে লাগল।

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

মেরি বলল- তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম তো, তাই।

— তোমরা কেউ কি খেয়াল করে দেখেছ, হাঁপানোর সময় তোমরা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলে?

মঞ্জু বলে উঠল—হ্যাঁ দিদি ঠিকই তো!

— দৌড়োনোর সময় বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তোমরা কী খরচ করো বলোতো?

শামিম বলল— শক্তি। তাই না দিদি?

— ঠিক। কিন্তু শক্তি পাও কোথা থেকে বলোতো?

অরুণ বলল— খাবার থেকে দিদি।

— ঠিক। কিন্তু খাবার থেকে আমরা শক্তি পাই কীভাবে জানো কি?

মেরি বলল— খাবার থেকে নিশ্চয়ই কোনোভাবে আমরা শক্তিটাকে বের করে নিই।

— ঠিকই বলেছ। কিন্তু কীভাবে? এসো এবারেই আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করি। আমরা বাতাস থেকে শ্বাস নিই। বাতাস থেকে আমাদের শ্বাস নেওয়াটা হলো প্রশ্বাস। আচ্ছা, বিষম খাওয়ার কথা আলোচনা করার সময় একটা বাতাস যাওয়ার নলের কথা বলেছিলাম। মনে আছে?

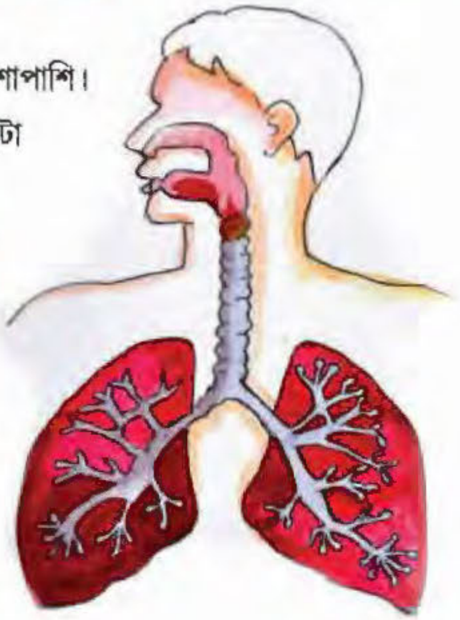

আফসানা বলল— হ্যাঁ দিদি। আমাদের গলার ভেতরে দুটো নল আছে পাশাপাশি।

অরুণ বলে উঠল— মনে পড়েছে দিদি। একটা দিয়ে খাবার যায়। আর অন্যটা দিয়ে যায় বাতাস।

— বাহ! তোমার তো খুব ভালো মনে আছে দেখছি। ওই বাতাস যাওয়ার নলটা হলো শ্বাসনালি। শ্বাসনালির শেষে দুটো থলির মতো অংশ আছে। এরা হলো ফুসফুস। প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালি হয়ে ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছোয়।

অরুণ জিজ্ঞেস করল— অনেকসময় তো আমরা মুখ দিয়েও প্রশ্বাস নিই। তাই না দিদি?

— ঠিকই। তবে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস নিলেও বাতাস কিন্তু শ্বাসনালি দিয়েই ফুসফুসে পৌঁছোয়। তবে নাক দিয়ে ঠিকমতো শ্বাস নিতে না পারলে তবেই মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল— বাতাস ফুসফুসে পৌঁছোনোর পর কী হয় দিদি?

— বাতাসের একটা উপাদান হলো অক্সিজেন গ্যাস। বাতাস ফুসফুসে পৌঁছোয়। ফুসফুস এবার ওই বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্যাসটাকে টেনে নেয়। আর তারপরে এই অক্সিজেন গ্যাসটাই শরীরের ভেতরে গিয়ে খাবার থেকে শক্তি বের করতে সাহায্য করে। দৌড়োনো বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তোমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। আর এই শক্তি তোমরা পাও খাবার থেকে। তাইতো?

আফসানা বলল— আর অক্সিজেন গ্যাস ওই খাবার থেকে শক্তি বের করতে সাহায্য করে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয় কেন দিদি?

—দৌড়োনো বা সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওঠার সময় বেশি শক্তির দরকার হয়।

পাশ থেকে অরুণ বলে উঠল — আর তার জন্য লাগে বেশি অক্সিজেন। আর বেশি অক্সিজেন শরীরে ঢোকানোর জন্য জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয়। তাই আমরা হাঁপিয়ে যাই। তাই না দিদি?

— ঠিক বলেছ। আমরা যেমন শ্বাস নিই, তেমনই আমরা শ্বাসও তো ছাড়ি। শ্বাস ছাড়াকে বলে নিশ্বাস।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, নিশ্বাস ছাড়ার সময়ও তো কিছুটা বাতাস আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় !

— হ্যাঁ। ঠিক তাই। এই বাতাসের সঙ্গেই আমাদের শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

শামিম জিজ্ঞেস করল — নিশ্বাস ছাড়ার সময় বাতাস কীভাবে আমাদের শরীরের বাইরে বেরোয়?

— প্রশ্বাসের সঙ্গে যে পথ দিয়ে বাতাস শরীরে ঢুকেছিল, আবার নিশ্বাসের সঙ্গে সেই পথেই বাতাস বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রশ্বাস আর নিশ্বাসকে একসঙ্গে বলে শ্বাসক্রিয়া। শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিমাণ মতো অক্সিজেন শরীরে ঢুকলে তবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

খাবার থেকে শক্তি পাই কীভাবে?

খাবার —(হজম)→ [ ] —(অক্সিজেন)→ [ ] → কাজ

প্রশ্বাসের পথ

নাক → [ ] → ফুসফুস

নিশ্বাসের পথ

ফুসফুস → শ্বাসনালি → [ ]

অরুণ জিজ্ঞেস করলে— গাছ খাবার তৈরি করার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নেয়। আর অক্সিজেন গ্যাস ছাড়ে। তাহলে শ্বাসক্রিয়ার সময় গাছ কী করে?

দিদিমণি বললেন— ভালো প্রশ্ন করেছ। গাছও অন্যান্য প্রাণীদের মতো শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন নেয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

নীচের ঘটনাগুলো তুমি দেখো আর ভাবো:

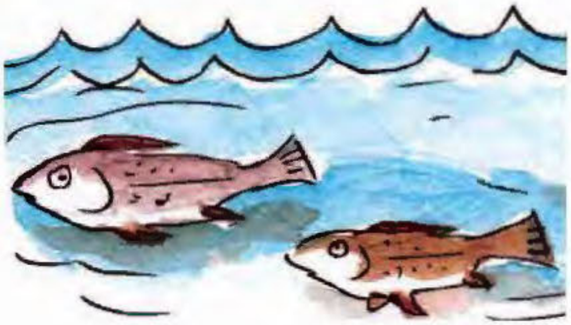

রুই, কাতলা মাছ জল থেকে তুললেই মারা যায়। কিন্তু শোল, ল্যাটা, কই, শিঙি, মাগুর মাছ জল থেকে তোলার পরও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে!

কেঁচোর থাকার গর্তগুলো যখন বর্ষাকালে জলে ভরে যায় তখন কেঁচো কেন ওপরে উঠে আসে ?

আমরা তো শিখলাম প্রশ্বাস আর নিশ্বাসের সময় আমরা নাকের ফুটোকে ব্যবহার করি। কিন্তু ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভানোর সময়,শাঁখ বা ভেঁপু বাজানোর সময় আমরা কী করি ?

ঘরে মশার ধুপ জ্বালালে, কাঠের গুড়ো নাকে ঢুকলে, পরাগরেণু বা ছত্রাকজাতীয় জীব শ্বাসনালীতে ঢুকলে কী কী সমস্যা হতে পারে ?

তোমার বাড়ির কেউ যদি কয়লাখনি, কাচের কারখানা, তুলোর কাজ বা অ্যাসবেস্টসের কাজে যুক্ত থাকেন কিংবা নিয়মিত সিগারেট খান, তবে ফুসফুস বা শ্বাসনালির রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

শ্বাসবায়ু ও স্বাস্থ্য

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন— এবারে বলোতো প্রতিদিনের কাজ করার শক্তি পেতে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী দরকার?

অরুণ বলল— জানি দিদি। দেখতে হবে যাতে পরিমাণমতো অক্সিজেন শরীরে ঢোকে। তবেই তো আমরা কাজ করার শক্তি পাব।

শামিম বলল— আমার দাদু প্রায়ই রাতে জেগে থাকেন। শুলেই কাশি হয়। আর বুকে খুব কষ্ট, দম নিতেও কষ্ট হয়।

— দাদুকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে তো?

শামিম বলল— হ্যাঁ দিদি। ডাক্তারবাবু বলেছেন দাদুর নাকি ফুসফুসের কাজ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাই দাদু আর আগের মতো শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারছেন না।

— আসলে অক্সিজেন যতটা দরকার, ততটা তোমার দাদু নিতে পারছেন না। আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডও পুরোটা বের করতে পারছেন না শরীর থেকে।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—শামিমের দাদুর দমের কষ্ট হচ্ছে কেন দিদি?

— বেশি করে অক্সিজেন পাওয়ার জন্য উনি বেশি করে প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আবার একইসঙ্গে নিশ্বাস ছাড়তেও কষ্ট হচ্ছে।

আফসানা বলল— খুব জোরে দৌড়ে এলে আমাদের যেমন কষ্ট হয়, অনেকটা তেমনি, তাই না দিদি?

— ঠিক তাই।

শামিম বলল—জানেন দিদি ডাক্তারবাবু আবার দাদুর বুকের ছবিও তুলেছেন। এই ছবি কেন তোলে দিদি?

— একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বুকের ছবি তোলা হয়। আমাদের বুকের ভেতরের বিভিন্ন অংশ এই ছবিতে দেখা যায়। ফুসফুস কেমন আছে, সেটাও এই ছবি থেকে বুঝতে পারা যায়। সেইরকম একটা ছবি ওপরে দেখানো হলো।

অরুণ জিজ্ঞেস করল—শামিমের দাদুর মতো এমন কেন হয় দিদি?

— যে-কোনো ধরনের ধোঁয়া বা ধুলো শরীরের ভেতরে ঢুকে ফুসফুসের ক্ষতি করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেড়ে যেতে পারে। ফলে সাধারণ হাঁটাচলা করতে গেলেও মানুষ হাঁপিয়ে যেতে পারে।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করল—কী করলে ফুসফুস ভালো থাকবে দিদি?

— খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। নিয়মিত শ্বাসের ব্যায়াম করা দরকার। মুক্ত বাতাসে ছোটাছুটি বা খেলাধুলা করলেও ফুসফুস ভালো থাকে। এছাড়াও ফুসফুস ভালো রাখতে যে-কোনো ধরনের ধোঁয়া-ধুলো (যেমন- কলকারখানা বা গাড়ির ধোঁয়া) থেকেও দূরে থাকা দরকার।

জীবনের জন্য বাতাস

খবরের কাগজে পাহাড়ে ওঠার একটা ছবি আজ দিদিমণি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

দিদিমণি ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— এঁরা কেমন পোশাক পরেছেন?

পরান বলল— এঁদের প্রত্যেকের গায়েই মোটা পোশাক, পায়ে ভারী জুতো আর পিঠে কী একটা নলের মতো।

দিদিমণি বললেন— উঁচু পাহাড়-চূড়ায় বাতাস কমে যায়, তাই অক্সিজেন কম থাকে। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়।

পরান বলল— ওরা তাহলে উঁচু পাহাড়ে ওঠার জন্য সিলিন্ডারে ভরে অক্সিজেন গ্যাস সঙ্গে নিয়ে যায়।

—একটা রুই বা কাতলা মাছকে জল থেকে মাটিতে তুললে কী হয় বলোতো ?

মিতুন বলল— ছটফট করতে করতে একসময় নিস্তেজ হয়ে যায়।

— গাছপালা ও প্রাণী সকলেরই জীবনের সঙ্গে অক্সিজেন জড়িয়ে আছে। আমরা শ্বাস নেবার সময় যে বাতাস নিই, তার অক্সিজেনটা আমাদের কাজে লাগে। তাই বাতাসে যদি দরকার মতো অক্সিজেন না থাকে তবে শ্বাসকষ্ট হয়। এসো আমরা বুঝে নিই বাতাসে অক্সিজেন থাকার প্রয়োজন কতটা।

ওপরের ছকগুলো দেখো। নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

ক. ১ নং ছক গাছ কীভাবে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কাজে লাগায়?

....।

খ. ২নং ও ৩নং ছক কোথায় মিল বা অমিল দেখতে পাচ্ছ তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

....।

দিদিমণি বললেন— তাহলে দেখো বাতাসে অক্সিজেনও আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডও আছে।

বাতাসের মধ্যে এত কিছু!

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন — একটা ভিজে কাপড় রোদের মধ্যে মেলে দিলে কী হয়? মিতালি বলল — কাপড়টা শুকিয়ে যায়।

— তখন ভিজে কাপড়ের অত জল কোথায় যায় বলোতো? ভিজে কাপড় শুকিয়ে গিয়ে তার জলটা বাতাসেই মিশে যায়। সাধারণতঃ শীতকালে ভিজে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয় কিন্তু বর্ষাকালে দেরি হয়।

এরপর দিদিমণি একটা শুকনো গ্লাসের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিলেন। গ্লাসটা কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে সবাই যা দেখছে তা বলতে বললেন।

নিনা বলল— প্রথমে গ্লাসের গায়ে গুঁড়িগুঁড়ি জল জমা হলো। তারপর গ্লাসের গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

— এই জলটা কোথা থেকে এল? বাতাসের মধ্যেই জলীয় বাষ্প মিশে আছে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। ঠান্ডা গ্লাসের স্পর্শে এসে তারা জলের ফোঁটা তৈরি করল।

রেহানা বলল— পুকুর, নদী, সাগরের জল শুকিয়ে এই জলীয় বাষ্প বাতাসে আসে তাই না দিদি?

— ঠিক বলেছ। আবার জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়। তখন বাতাসে ভেসে থাকা সূক্ষ্ম ধুলোর কণার ওপর জলের ফোঁটাগুলো জমে। এভাবেই মেঘ তৈরি হয়।

মিতালি বলল— কিন্তু এত ধুলোর কণা কীভাবে আসে বাতাসে?

— নানাভাবেই আসতে পারে। পাথর ভাঙার সময় তার গুঁড়ো বাতাসে মেশে। গাড়ি চললে, জোরে বাতাস বইলে, ধুলোঝড় শুরু হলে, কয়লা ভাঙলে — এরকম কণা বাতাসে মিশতে থাকে। বাতাসে জলীয় বাষ্প কমে গেলেও মাটির কণাও ধুলো হয়ে বাতাসে মিশে যায়।

— আরো কী কী বাতাসে মিশে থাকে?

— লেপ-তোশক বানানোর সময়, চটকলে পাটের দড়ি-বস্তা তৈরির সময় তার রোঁয়া মিশে যায় বাতাসে। বিভিন্ন ফুলের রেণুও এভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। দিনের বেলা একটা বন্ধ ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো ঢুকলে এই গুঁড়োগুলোকে বাতাসে ভাসতে দেখো।

— রাতে টর্চের আলো জ্বাললেও এদের দেখা যায়। দেখা যায় না এরকম আরো কিছু কি বাতাসে আছে দিদি?

— হ্যাঁ, বাতাসে থাকে নানান বর্ণহীন গ্যাস যাদের আমরা দেখতে পাই না। নীচের ছবিতে বাতাসে তাদের কোনটা বেশি কোনটা কম হলো।

যে গ্যাসটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে তার নাম কী?

১ নাইট্রোজেন
২ অক্সিজেন
৩ জলীয় বাষ্প
৪ নিষ্ক্রিয় গ্যাস
৫ কার্বন ডাইঅক্সাইড

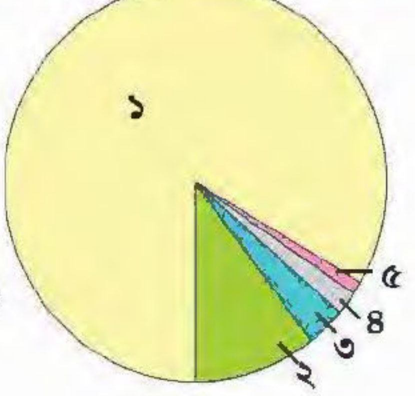

— পাশের ছবিটা দেখো। বাতাসের মধ্যে থাকা উপাদান কোনটা কতটা আছে তা বিভিন্ন রং-এ দেখানো হয়েছে। তোমাদের বোঝার জন্য ছবিতে রং দেওয়া হলো।

— নাইট্রোজেন গ্যাস।

— এটাও আমাদের শরীরের জন্য খুবই দরকারি। বাতাসে সবচেয়ে বেশি থাকলেও উদ্ভিদ বা প্রাণীরা সরাসরি এটা নিতে পারে না। এছাড়াও বাতাসে আরো অন্যান্য কিছু গ্যাস থাকে।

— আচ্ছা দিদি, সব জায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে?

— না, সবজায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে না। ওপরের ছবিটি দেখে বলতো কলকারখানা অঞ্চলের বাতাসে কী কী মিশতে পারে?

পরাণ বলল— কলকারখানা থেকে বেরোনো ধোঁয়া, ধুলো এসব মিশে যায় বাতাসে।

— এগুলো আসলে বাতাসের অবাঞ্ছিত উপাদান। তখন তাহলে বাতাসের উপাদানগুলোর পরিমাণের কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়।

নীচের তালিকায় বাতাসে উপস্থিত কিছু পদার্থের নাম দেওয়া হলো। কোন ক্ষেত্রে এগুলির কম বা বেশি হতে পারে তা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো।

বাতাসে থাকা কয়েকটি পদার্থের নাম	কলকারখানা অঞ্চলে
১. অক্সিজেন	
২. কার্বন ডাইঅক্সাইড	
৩. ধুলোর কণা	

— তাহলে তো দিদি, সব জায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে না!

— তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ। স্থান বা সময় পালটে গেলে ওই উপাদানগুলোর পরিমাণ পালটে যায়।

তোমরা বন্ধুরা মিলে একটু খুঁজে দেখো কোন কোন জায়গা থেকে তোমাদের এলাকার বাতাসে অবাঞ্ছিত জিনিস মিশছে। সেই উৎসগুলোর নাম লেখো।

কোন জায়গায়	বাতাসে কী কী মিশছে
১. গাড়ি চলাচলের রাস্তায়	ধুলো, ধোঁয়া
২.	....
৩.	....
৪.	....

শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে তোমাদের স্কুলে একটা পোস্টার আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করো :
বিষয়— নির্মল বায়ু ও প্রাণ (নিজেরাও বিষয় পছন্দ করো)।

সময় বা কাল পালটে গেলে বাতাসের আরও কী কী পদার্থ বদলে যায় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

কখনও গরম, কখনও বৃষ্টি, কখনও বা ঠান্ডা

দিদিমণি বললেন— বাতাসে কী কী উপাদান আছে আগের দিন তা আমরা জেনেছি। বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো কমে বাড়ে তাও আমরা জেনেছি। একই জায়গায় বছরের বিভিন্ন সময়ে এই উপাদানগুলোর কমা-বাড়া কি তোমরা বুঝতে পারো? ভিজে জামাকাপড় বর্ষাকালে সহজে শুকোতে চায় না। কিন্তু শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তার কারণ হলো শীতকালের বাতাসে জলীয় বাষ্প কম।

বছরের কোন কোন সময়ে উষ্ণতা বাড়ে বা কমে। এবার নীচের ছবিগুলি দেখো। বছরের বিভিন্ন সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো ছবির পাশে লেখো

হাঁসফাসানো গ্রীষ্মে সবার প্রাণ করে আইঢাই

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

আকাশ জুড়ে ছড়ানো মেঘ পেঁজা তুলোর ভেলা।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

মাঠে মাঠে সোনালি ধান চাষির মুখে আনন্দের গান

শীত লেগেছে ডালে ডালে কেবল পাতা ঝরা
শীত লেগেছে ছেলে বুড়োর গরম জামাপরা।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

বসন্ত আজি রাঙায় ডালি, রং-বেরঙের ফুলে
আমের ডালে গাইছে কোকিল হাওয়ায় দুলে দুলে।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য

দিদিমণি বললেন— ছবি দেখে তোমাদের কী মনে হলো?

শ্যাম বলল — বছরের বিভিন্ন সময় রোদের তেজ একরকম নয়। শুধু রোদ কেন, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশাও বছরের সব সময় একরকম হয় না বা থাকে না। দিন বা রাতও ছোটো বড়ো হয়।

দিদিমণি বললেন — কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন জায়গার এই বিষয়গুলি কেমন থাকে সেটাই হলো ওই জায়গার আবহাওয়া।

তাহলে এবার নীচের জায়গাগুলোতে আবহাওয়া কেমন হতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়

অঞ্চলের নাম	আবহাওয়া কেমন
পাহাড়ি অঞ্চলে	
সমুদ্রের ধারে	
লালমাটির অঞ্চলে	
জঙ্গলের ধারে	

বছরে নীচের মাসগুলোতে আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয়গুলো কেমন ছিল তা তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূরণ করো। দরকারে বন্ধু বা শিক্ষক -শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

মাস	আবহাওয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য			
	গরম কতটা ছিল	রোদ ঝলমলে ছিল/ মেঘলা ছিল	বৃষ্টি কতটা হয়েছে (বেশি/মাঝারি/কম)	বাতাস কত জোরে বইছিল
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল- মে - জুন)				
আষাঢ়-শ্রাবণ (জুন-জুলাই-আগস্ট)				
ভাদ্র-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)				
কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর - ডিসেম্বর)				
পৌষ-মাঘ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)				
ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল)				

ওপরের তালিকাটা ভালো করে দেখো। এর থেকে এমন বিষয় লেখো যেগুলো বদলালে আবহাওয়া বদলায়।

কী কী বিষয়ের ওপর আবহাওয়া নির্ভর করে	ওগুলো বদলালে আবহাওয়ার কী কী পরিবর্তন হয়
১. বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ২. ৩.	

এবার তোমরা নীচের ছবিগুলোতে নানা রং ও আকারের মেঘ দেখো। তারপর শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে নীচে লেখো।

গরমকালের মেঘ

বর্ষাকালের মেঘ

শরৎ ও শীতকালের মেঘ

মেঘের রং কেমন	বছরের কোন সময়ের মেঘ	ওই সময়ের আবহাওয়া কেমন	কোন মেঘে ঝড়বৃষ্টি হয়

কত রকম ফুল, কত রকম উৎসব

দিদিমণি বললেন— এই আবহাওয়ার জন্যই চারিদিকে কতই না ঘটনা ঘটছে। তোমরা কি তার কয়েকটা বলতে পারো?

আমিনুল বলল — আমাদের ভগবানগোলায় মাইলের পর মাইল জুড়ে আমবাগান। কিন্তু দুঃখের কথা এবার আমগাছে মুকুলই আসেনি। গত বছর তো শিলাবৃষ্টি হয়ে ছোটো আমগুলো নষ্ট হয়ে গেছিল। একবার মাঠেই সরষে নষ্ট হলো। সজনে গাছে ফুল ফুটতে দেরি হয়। ধান গাছে পোকা লাগে।

বুধনের বীজতলার ধানের চারা এবছর মাঠে রোয়ার আগেই হলুদ হয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে বৃষ্টির কোনো দেখা নেই। এত গরম পড়েছে যে পুকুরের জলও শুকিয়ে গেছে।

মিনতিদের কাঁচা বাড়ি সেদিনের ঝড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আরো কত দোকানপাটের চাল উড়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন— রেডিয়ো বা টিভিতে বা খবরের কাগজে প্রতিদিন আবহাওয়ার আগাম খবর থাকে। এবার থেকে তোমরা রোজ তা শুনবে ও পড়বে। তারপর প্রতিদিন ক্লাসে এসে একজন করে আবহাওয়ার ওই খবর বলবে। এতে আগে থেকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি কমানো যাবে।

শমীকরা আমিনার কাছে শুনেছে সমুদ্রের ধারের আবহাওয়া নাকি সারা বছর একইরকম থাকে।

দিদিমণি বললেন— সারা বছর এক না থাকলেও বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রত্যেক জায়গার আবহাওয়া একরকম থাকে। দেখোতো আমার কথার সঙ্গে তোমাদের অভিজ্ঞতা মেলে কিনা?

মাসের নাম	আবহাওয়া
১। ডিসেম্বর - জানুয়ারি	বেশ ঠান্ডা, বৃষ্টি হয়নি, আকাশ পরিষ্কার, উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়
২। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	
৩। আষাঢ়-শ্রাবণ	
৪। সেপ্টেম্বর -অক্টোবর	
৫। ফেব্রুয়ারি- মার্চ	

দিদিমণি বললেন — বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়জুড়ে কোনো জায়গায় একইরকম আবহাওয়া থাকে। সেটিই হলো ঋতু।

আকাশ বলল— তাহলে যে সময় খুব বৃষ্টি হয় তা হলো বর্ষা ঋতু ?

—ঠিক তাই। এরকম অন্য ঋতুগুলো হলো— গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

বিভিন্ন ঋতু আর ফুল, ফল ও উৎসব

তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন ঋতুর ফুল, ফল ও উৎসবের কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

ঋতুর নাম	কী কী ফুল ফোটে	কী কী ফল পাওয়া যায়	কী কী উৎসব হয়
গ্রীষ্ম	জুঁই, ...	আম, ...	রবীন্দ্র জয়ন্তী, বর্ষবরণ, ...
শরৎ			
শীত			
বসন্ত			

দিদিমণি বললেন— বড়ো বড়ো কবিরা এই ঋতু নিয়ে কত গান, কবিতা লিখেছেন। এরকম একটা গানের সঙ্গে আমি একবার নেচেছিলাম— 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ....'।

অসীমা বলল— আমিও নেচেছি দিদি। গানটা হলো - 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় .....'।

নঈম বলল — আমি একটা ঋতুর কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেও পারি— 'এসেছে শরৎ, হিমের পরশ.....'।

তোমরা এবার ঋতু নিয়ে লেখা গান বড়োদের ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে সংগ্রহ করো ও বিভিন্ন ঋতুতে এগুলো গাওয়ার চেষ্টা করো।

ঋতুর নাম	গানের প্রথম লাইন
গ্রীষ্ম	দারুণ অগ্নিবাণে রে ....
বর্ষা	
শরৎ	শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি ...
হেমন্ত	
শীত	শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন .....
বসন্ত	

তোমার যে ঋতু সবচেয়ে ভালো লাগে তার সম্পর্কে লেখো।

ঋতুর পরিচয়	বর্ণনা
১. কোন কোন মাস জুড়ে ওই ঋতু	
২. আবহাওয়া কেমন থাকে	
৩. কোন কোন ফসল ফলে	
৪. কী কী উৎসব হয়	
৫. ওই সময় মানুষ কী কী পোশাক পরে	
৬. ওই সময় কী কী ফুল ফোটে	

আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী

কলমীশাক

সাপ

কেঁচো

নারকেল গাছ

বাবুই পাখি ও তার বাসা

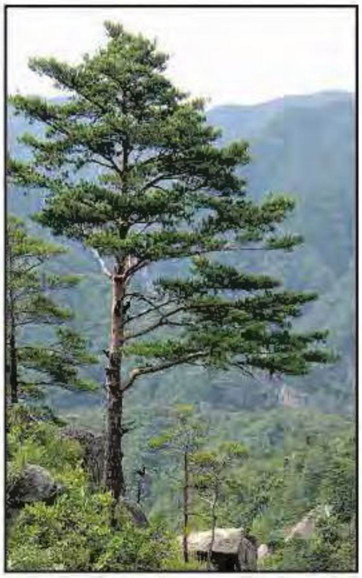

পাইন গাছ

মাছ

পলাশফুল

ক্যাকটাস

বাদাবন

রেডপাণ্ডা

শীতের ছুটির পরে সবাই স্কুলে এসেছে। সমীর বলল— জানিস ছুটিতে বাবা আমাদের একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছিলেন। বাঘ, সিংহ, হরিণ, ময়ূর, সাপ, হাতি, বাঁদর, পাখি - কত কী দেখলাম।

আসলাম জিজ্ঞেস করল— চিতা দেখিসনি ?

চিতাবাঘ চিতা

সমীর বলল— নারে চিতা দেখিনি, দেখলাম চিতাবাঘ।

আয়েষা বলল— 'সোনার কেল্লা' সিনেমায় দেখিসনি, বালির ওপর দিয়ে উট কেমন দৌড়োচ্ছিল।

মানস জিজ্ঞেস করল— উটপাখি কোথায় থাকেরে?

সমীর বলল— খাঁচার গায়ে লেখা ছিল। পরে তোদের বলব।

অ্যালিস জিজ্ঞেস করল — সাপ তো গর্তে থাকে । আমি দেখেছি। চিড়িয়াখানায় সাপ কোথায় দেখলি?

সমীর বলল— একটা ঘরের মধ্যে খোপ খোপ করা ছিল। খোপের সামনে দেখার জন্য কাচ দেওয়া ছিল।

বৈশাখী বলল— বাঘ, সিংহও তো আসলে জঙ্গলে থাকে। চিড়িয়াখানায় না হয় খাঁচায় থাকে।

আসলামের মনে প্রশ্ন— আচ্ছা একই বনে বাঘ, সিংহ সবাই কী একসঙ্গে থাকে? স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

চিতাবাঘ চিতা

ক্লাসে আসলাম স্যারকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল। স্যার বললেন— দাঁড়াও আগে তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাই। ছবি দেখেই সোনম চেঁচিয়ে উঠল—আরে এটা তো রেডপান্ডা। দার্জিলিঙে মামার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি।

আরেকটা ছবি দেখে সমীর বলল— এ তো বাবুই পাখির বাসা। জলিলচাচার বাড়ির তালগাছগুলোতেই তো এরকম কত ঝুলে আছে।

বৈশাখী বলল— আর এটা তো কলমিশাক। আমাদের পুকুরের ধারেই তো কত হয়ে আছে।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন- আসলামের প্রশ্নের উত্তর কী হবে বলোতো এবারে ?

সোনম বলল — বিভিন্ন প্রাণী আর উদ্ভিদের থাকার জায়গা আলাদা আলাদা। কেউ থাকে জঙ্গলে, কেউ বা আবার জলে, কেউ আবার গর্ত খুঁড়ে তার ভিতরে থাকে।

স্যার বললেন— আমাদের দেশে বাঘ আর সিংহ থাকে আলাদা আলাদা জঙ্গলে। একসময় মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সিংহ আর চিতা একসঙ্গে থাকত। মানুষের অত্যাচারে ওই জঙ্গল থেকে ওরা একদিন হারিয়ে গেল। এখন ওদের ভারতের কোথায় দেখা যায় বলতে পারবে কি?

আয়েষা জিজ্ঞেস করল— চিতা মানে তাহলে চিতাবাঘ নয়।

— না। ঠিক যেমন শালিখ আর ময়না এক নয়।

তোমরা এবার আগের ছবিগুলো ভালো করে দেখো। আর ছবির উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নাম লেখ। চিনতে পারলে তাদের থাকার জায়গাগুলি লিখে ফেলো।

ক্রমিক নং	উদ্ভিদের নাম	থাকার জায়গা	ক্রমিক নং	প্রাণীর নাম	থাকার জায়গা
১.	কলমিশাক		১.	বাবুই	
২.			২.		
৩.			৩.		
৪.			৪.		
৫.			৫.		
৬.			৬.		
৭.			৭.		
৮.			৮.		

কোথায় থাকে তারা

স্যার বললেন— জীবের থাকার জায়গার ছবিগুলো দেখো। ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হলো?

আয়েষা বলল— সব জায়গা তো আমদের বাড়ির চারপাশের মতো নয়। কোথাও খুব উঁচু। কোথাও নীল জলে বড়ো বড়ো ঢেউ। আবার কোথাও বা সাদা বরফ।

— ঠিকই। এই পৃথিবীর সব জায়গা আমাদের এলাকার মতো নয়।

জলিল বলল— উদ্ভিদ আর প্রাণীদের থাকার এতরকম জায়গাও আছে পৃথিবীতে!

স্যার বললেন— জীবেরা এত বিচিত্র পরিবেশে বাস করে কী করে, বলতে পারবে কি?

নীচের ছবিগুলো দেখো। ছবিতে দেখানো এই এতরকম জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুরা থাকে। ওই জায়গাগুলো চেনার চেষ্টা করো।

বৈশাখীরা বলল— আসলে কোনো প্রাণীর হয়তো সমুদ্রের নোনা জলে থাকতে সুবিধে হয়, কেউ আবার হয়তো পুকুরের মিষ্টি জলে মানিয়ে নিয়েছে। কোনো উদ্ভিদ হয়তো পাথুরে মাটিতে ভালো জন্মায়, অন্য আরেকটা উদ্ভিদ হয়তো আবার আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরধারে স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে ভালো জন্মায়।

প্রবাল প্রাচীর

— খুব ভালো বলেছ। তার মানে যেখানে জীবদের বাস করার অনুকূল পরিবেশ থাকে, সেখানেই সে থাকে। সেটাই তার বাসস্থান। একটা পচা কাঠ উলটে দেখো। দেখবে কিলবিল করে কিসব পোকা বেরোচ্ছে। আবার মানুষের মাথার চুলে থাকে উকুন, খাবারের নালীতে থাকে কৃমি, গন্ডারের পিঠে থাকে পোকা। এগুলো সবই এক এক ধরনের বাসস্থান।

এই কথা শুনে সমীর বলল— কয়েকদিন আগে আমার ম্যালেরিয়া হয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে রক্তে নাকি জীবাণু বাসা বেঁধেছে।

— ঠিক বলেছ। আমাদের দেহের খাবারের নালি, ফুসফুস, চোখ, কানের মতো সব অঙ্গেই জীবাণুরা থাকতে পারে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের দেহেও জীবাণুরা থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পারলে যে শুধু ফাঁকা জায়গা হলেই তা বাসস্থানের অনুকূল নাও হতে পারে । এজন্যই কি মরুভূমিতে কাঁটা গাছ আর উট ছাড়া সেরকম কোনো জীবজন্তু চোখে পড়ে না? যে অঞ্চলে অনেক জীব থাকে তারা একে অপরের বেঁচে থাকার অনুকূল বাসস্থান তৈরি করে দেয়। ঘন বন বা সমুদ্রের নীচে প্রবাল প্রাচীরে এই ঘটনাই ঘটে।

আগের পাতার ছবি দেখে জীবদের থাকার নানারকম জায়গার নাম লেখো।

জীবের নাম	জীবদের থাকার নানারকম জায়গা নাম
১. উট ২.	

তোমার জানা এরকম কতগুলো উদাহরণ দাও যেখানে একটি জীব অন্য আর একটি জীবের বাসস্থান তৈরি করে দেয়।

বিষয়	উদাহরণ
১. একটাউদ্ভিদ আরেকটা উদ্ভিদের বাসস্থান তৈরি করে	১. খেজুর গাছ .... গাছের বাসস্থান ।
২. একটা উদ্ভিদ আরেকটা প্রাণীর বাসস্থান তৈরি করে	২.
৩. একটা প্রাণী আরেকটা প্রাণীর বাসস্থান তৈরি করে	৩.

সমীর এবারের ছুটিতে গুজরাটে বেড়াতে যাবে। উত্তেজনায় কয়েকদিন ধরে ওর ঘুম আসছে না। শেষ পর্যন্ত ছবির সিংহকে স্বচক্ষে দেখবে। স্যার বললেন— ভারতীয় সিংহ, একমাত্র গুজরাটের গির অরণ্যেই পাওয়া যায়। এইরকমই আর একটা প্রাণী হলো আসামের মুগা রেশম মথ। এদের বাসস্থান কমতে কমতে ওই এক জায়গায় এসে থমকে গেছে। যদি ভবিষ্যতে এই জায়গাটা থেকেও এরা হারিয়ে যায় তবে আর এদের দেখতে পাওয়া যাবে না।

সিংহ

মুগা রেশম মথের শূককীট

নীচের ছবিগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করো ওই প্রাণীগুলো কোন কোন বাসস্থানে থাকে বা থাকতে পারে ।

প্রাণীর নাম	যেসব জায়গায় দেখতে পাবে
১. বাঘ	১. বাদাবন, ...
২. কাক	২. আস্তাকুঁড়, ...
৩. কচ্ছপ	৩.
৪. চড়াই পাখি	৪. বাড়ির ঘুলঘুলি, ঘরের চালের নীচে, ...
৫. আরশোলা	৫.
৬. গোসাপ	৬.

থাকার জায়গা যাচ্ছে হারিয়ে

স্যার বললেন— সেদিন একটা খবরের কাগজ থেকে 'বিপন্ন বাসভূমি' নামে একটা লেখা তোমাদের পড়ে শুনিয়েছিলাম। মনে আছে কি ?

স্যারের প্রশ্নের উত্তরে সোনম বলল— চারদিকে শহর বাড়ছে। জলাভূমি বুজে যাচ্ছে। আকাশ থেকে সুন্দরবনকে দেখলে নাকি মাথার টাকের মতো লাগে।

সোনম দম নেওয়ার জন্য একটু থামতেই আয়েষা বলে উঠল—আমিও বলব স্যার।

— হ্যাঁ, তুমিও বলো।

আয়েষা বলতে আরম্ভ করল— জঙ্গলের অনেক গাছ রোজ কাটা পড়ছে। বাড়ির আশেপাশে শিমুল গাছ থাকলে অনেকে আবার কুসংস্কারের বশে সেটা কেটে ফেলে। উঁচু ঘাসজমি ও জলার ঘাসজমি ক্রমশ কমছে।

স্যার বললেন— ঠিক বলেছ।

এসব শুনে সমীররা গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। তবে কি একদিন এই পৃথিবীর সব বাসস্থানই এভাবে হারিয়ে যাবে? মানুষ তখন যাবে কোথায়? এই উদ্ভিদ আর প্রাণীদের ওপর নির্ভর করেই তো মানুষের বেঁচে থাকা। তাই বিভিন্ন জীবের বাসস্থান বাঁচানোর ওপর ওরা একটা পোস্টার তৈরি করবে বলে ঠিক করল। পোস্টারের মাধ্যমে ওদের অঞ্চলের বিপন্ন উদ্ভিদ আর প্রাণীদের কেন বাঁচানো দরকার সেই বিষয়ে ওরা সবাইকে জানানোর চেষ্টা করবে।

অচেনা জায়গা

পরীক্ষার পরে দারুণ মজা

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে কালই। দাদার সঙ্গে বাসে করে মাসির বাড়ি যাচ্ছে বুবুন। একটা ব্রিজে ওঠার পর বুবুন দাদাকে জিজ্ঞাসা করল— এই নদীটার নাম কী?

দাদা বললেন— হুগলি নদী। হাওড়া আর কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ করে দিয়েছে এই ব্রিজ। এর নাম রবীন্দ্র সেতু। বুবুনের খুব মজা হচ্ছিল। বাস এসে থামল হাওড়া স্টেশনের পাশে। ট্রেনে ওঠার কিছুক্ষণ পর হুইসল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। এক সময়ে স্টেশন এল। বুবুন দেখল বিরাট স্টেশন। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। কলকাতার মতো ঘিঞ্জি নয়। বুবুনের বেশ ভালো লাগছিল। গন্ধটাও অন্যরকমের। ওর ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। ওরা দুজন হাঁটছিল। দু-পাশে পুকুর। পুকুরে ছোটো ছোটো পানা ভরতি। তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। চারিদিকে কতরকম গাছ। দাদা একটা গাছ দেখিয়ে বললেন—এটা ফলসা গাছ। বুবুন বলল—ফলসা কী গো? দাদা গাছ থেকে কয়েকটি ফলসা পাড়লেন। ছোটো ছোটো ফল। মুখে দিতেই যেন গলে গেল। বেশ মিষ্টি। তবে দানা আছে। বুবুনের দারুণ লাগছিল। আগে এমন জায়গায় ও কোনোদিন আসেনি।

বুবুনের বেড়ানোর গল্প পড়ে কেমন লাগল তোমাদের?

তোমরা নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

শেষ যেখানে বেড়াতে গেছ	কীভাবে গিয়েছিলে	কতদিন থেকেছ	কী কী দেখেছ	তোমার কেমন লেগেছে	সেই এলাকার কাছাকাছি কোনো বিখ্যাত জায়গার নাম

সাঁতরাগাছির ঝিলে পরিযায়ী পাখি

বুবুনের মনে পড়ল আজকে ওদের পাখি দেখতে যাওয়ার কথা হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল বুবুন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা স্টেশনে এল। ট্রেনে চেপে ওরা পৌঁছোল সাঁতরাগাছিতে। ট্রেনলাইনের পাশ দিয়ে রাস্তা। কিছু দূর হেঁটে ওরা পৌঁছোল ঝিলের ধারে। ও বাবা ঝিল কোথায়? এ তো পানা ভরতি ! বুবুন ভেবেছিল ঝিলে অনেক জল থাকবে । আর সেখানে অনেক পাখির আনাগোনা হবে। খানিক পরেই একদল বকের মতো পাখিকে উড়ে আসতে দেখল। দাদাকে জিজ্ঞাসা করল— ওগুলো কী পাখি? দাদা বললেন— ওগুলো নানা জাতের হাঁস। কোনোটা পিনটেল, কোনোটা আবার হুইসলিং টীল। দূর দেশ থেকে আসে। আগে আরও পাখি আসত। কিন্তু এখন তো জল বেশ নোংরা হয়ে গেছে। তাই ওদের আনাগোনাও কমে গেছে। বুবুনের মনে পড়ল বাবার সঙ্গে একদিন ও গোলপার্কের লেকে গিয়েছিল। ওখানে প্রচুর মাছ দেখেছিল। ও ভাবল, একদিন যদি ওখানেও কচুরিপানায় ভরে যায়, তাহলে সব মাছ মরে যাবে। এমনসময় একটা হুইসলিং টীল ওর একদম সামনে এসে বসল। বুবুন ঠিক করল, বাড়ি ফিরেই হাঁসটির ছবি আঁকবে। আর বড়ো হলে একটা ক্যামেরা কিনবে। আর পাখিদের ছবি তুলবে।

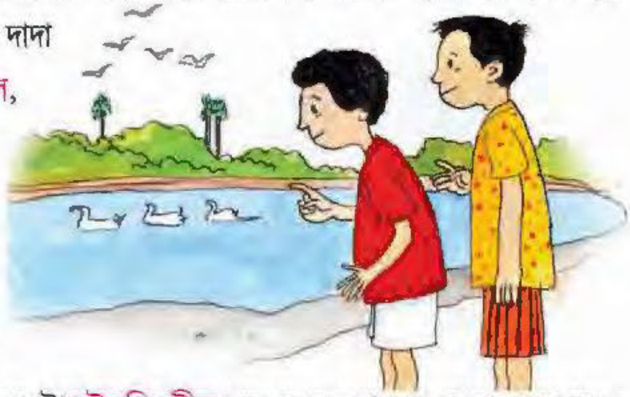

এবার বাড়ির বড়োদের/এলাকার মানুষজনের/শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে লিখে ফেলো।।

তোমার স্কুলের/বাড়ির/ বেড়াতে যাওয়া জায়গার কাছের ঝিলের নাম	সেখানকার গাছপালার নাম	সেখানকার দেখা প্রাণীর নাম	সেখানকার দেখা পাখির নাম

চেনা তবু অচেনা

স্যার বললেন— আমি একবার আসাম বেড়াতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ট্রেন কী কারণে হাসিমারা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনলাম ট্রেন আজ আর ছাড়বে না। গন্তব্য পাল্টে ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। দূরে কালো পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। একটু এগোতেই পেলাম চা বাগান। আগে কোনোদিন এ রাস্তায় আসিনি।

কিছুদূর এগিয়েই দেখা হলো এক চা বাগানের শ্রমিকের সঙ্গে। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁদের ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। কয়েকঘণ্টা পরেই আশেপাশে সবার সঙ্গে ভাব হলো। ওনার নাম নরেশ রাভা। বাড়ি থেকে একটু এগোলেই নাকি এক বিরাট নদী। তার পাড়ে ঘাসের জঙ্গল। সেখানে নাকি এক খড়গওলা জন্তু থাকে।

পরের দিন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লাম বন আর নদী দেখতে। বনে ঢুকতেই দেখা মিলল এক দাঁতাল হাতির সঙ্গে। তারপর হরিণ, বাইসন আরও কত পাখি। কিন্তু যার জন্য আসা তার দেখা মিলল না।

নরেশ বললেন - দূরে যে ঘাসজঙ্গল দেখছেন ওখানেই ওরা বেশি থাকে। অনেকক্ষণ টাওয়ারে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ ঘাসের জঙ্গল নড়ে উঠল। তারপর বেরিয়ে এল বাচ্চা নিয়ে ওই জন্তু। আরে, এ তো ছবিতে দেখা সেই গন্ডার। তবে আমি কোথায় এসেছি?

নরেশ বললেন— এ জঙ্গল হলো জলদাপাড়া। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বইছে হলং নদী। আর জঙ্গলের আর একদিকে আছে তোর্সা নদী।

তিন-চার দিন আমার জঙ্গলের পশুপাখি আর চা বাগান দেখে সময় কেটে গেল। একদিন এক পাথুরে রাস্তায় নদীর ধার বরাবর ওরা নিয়ে গেল ভুটানের কাছাকাছি এক জায়গায়। সেখানে টোটোদের সঙ্গে দেখা হলো। এদের ভাষা, চেহারা, খাবার এসবই আমার অজানা ছিল। বইতে পড়া পুরোনো সমাজের সঙ্গে ওদের অনেক মিল খুঁজে পেলাম।

নরেশ বললেন— আমাদের এখানে ঘুরলে আপনি এরকম বহু অজানা, অচেনা মানুষের এবং জায়গার খোঁজ পাবেন। সন্ধেবেলা হতেই নরেশদের পাড়ায় নাচ-গানের অনুষ্ঠান। মেয়েরা জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে রাভা নৃত্য দেখাল। সেই নাচ যেমন বর্ণময়, তেমনই দলগত। পাশের পাড়ায় গেলে আপনি মেচদের মাছ ধরার নাচ দেখতে পাবেন।

দিন-রাত

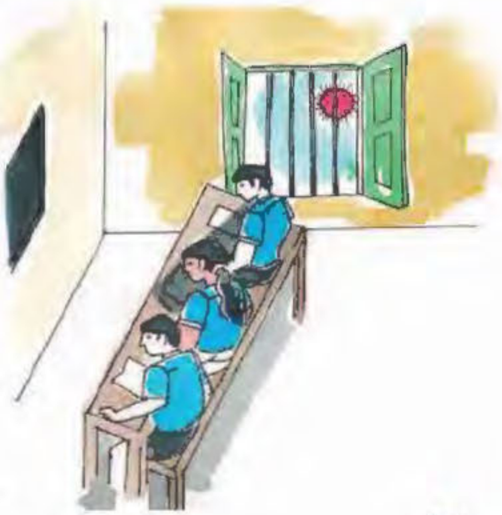

১১টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজল। এবার ক্লাস শুরু হবে। রুকসানা, রাহুল আর রাখি বসেছিল জানালার ধারে একটা বেঞ্চে। জানালা দিয়ে রোদ আসায় রাহুলের ছায়াটা রুকসানার খাতার ওপর পড়ছে। রুকসানার অসুবিধা হচ্ছে। ও বারবার রাহুলকে বলছে — আলোটা একটু ছাড় না। রাহুল বলল— আমি কী ইচ্ছা করে করছি, জানালা দিয়ে রোদ এলে আমি কী করব। দিদিমণি শুনতে পেয়ে বললেন— তোমরা ঝগড়া কোরো না, আর একটু পর ওই ছায়া আর থাকবে না।

এরপর ক্লাসের শেষ হবার পর দিদিমণি ক্লাস শেষ করে চলে গেলেন।

কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে আসা রোদ উধাও। সঙ্গে সঙ্গে, ছায়াও উধাও।

ওরা এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। ঠিক করল পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করবে।

পরদিন দিদিমণি ক্লাসে এলে রাহুল ওই কারণটা জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন— তোমাদের মনে আছে, তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে ছায়া নিয়ে কত খেলা করেছ।

রুকসানা বলল — হ্যাঁ, দিদিমণি খুব মনে আছে। আমাদের ছায়া যেদিকে পড়ে তার উলটোদিকে থাকে সূর্য।

রাহুল বলল — সকালবেলা আমাদের ছায়া পড়ে পশ্চিম দিকে। তার মানে সূর্য থাকে পূর্ব দিকে।

— ঠিক বলেছ রাহুল।

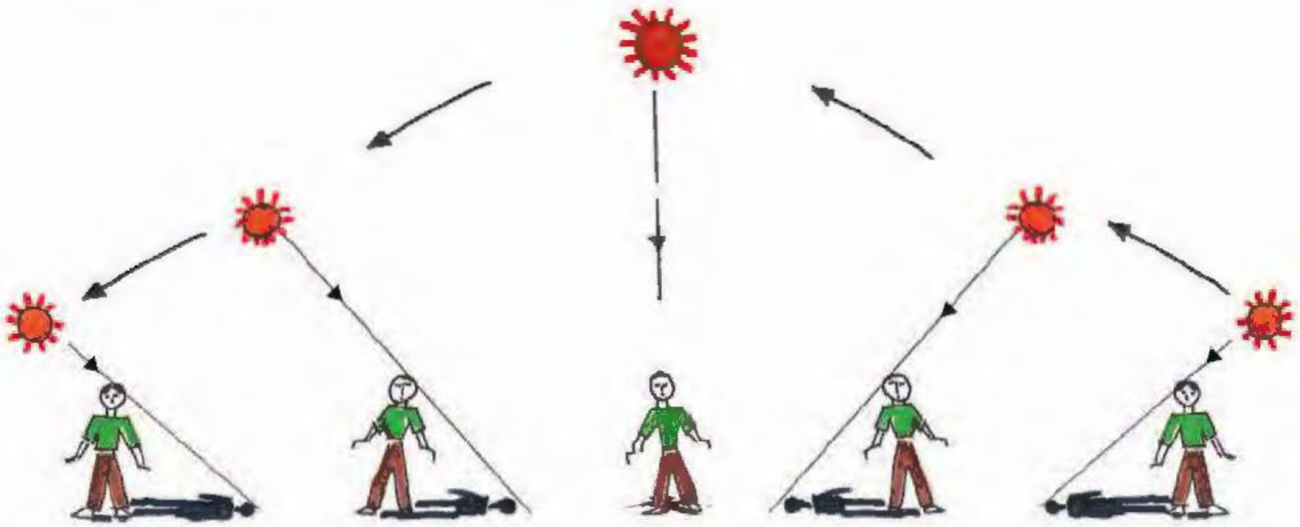

আলোচনা করে নীচে লেখো।

তোমার ছায়া	কখন	কোন দিকে গঠিত হয়	তখন সূর্যের অবস্থান
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো	দুপুর বারোটার সময়	পায়ের ঠিক কাছাকাছি	প্রায় মাথার উপরে
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়ো			
ক্রমে বড়ো থেকে ছোটো			
ক্রমে ছোটো থেকে বড়ো			

সবাই ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দিদিমণিকে দেখাল। দিদিমণি এবার জিজ্ঞেসা করলেন — তোমাদের তাহলে কী মনে হয়? কেন এমন হলো?

—সূর্যকে তো এক এক সময় এক এক দিকে দেখা যায়। তাই আমাদের ছায়াও কখনও পূর্বে কখনও পশ্চিমে গঠিত হয়। ছায়া কখনও ছোটো কখনও বড়ো হয়।

দিদিমণি হাসলেন। বললেন— এসো আমরা একটা মজার খেলা খেলি। এই বলে দিদিমণি একটা কলমদানি, একটা কলম আর একটা বড়ো মুখের টর্চ ব্যাগ থেকে বার করলেন।

এরপর কলমসহ কলমদানিটা টেবিলের পূর্বপ্রান্তে রাখলেন (ছবিতে দেখো)। ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হলো। ইকবাল জ্বালানো টর্চটাকে ছবির মতো করে টেবিলের অনেকটা ওপরে ধরল।

এবার দিদিমণি টেবিলকে ধীরে ধীরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে (সমান মেঝের ওপর) ঠেলতে থাকলেন। বললেন— তোমরা সবাই কলমের ছায়াটাকে লক্ষ করো। কলমটা যখন টর্চকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল, দিদিমণি খেলা শেষ করলেন।

সমতল (সমান) মেঝে ও হালকা টেবিল না পাওয়া গেলে, টেবিল বা বেঞ্চির ওপর একটা টেবিলক্লথ বা যে কোনো কাপড় পেতে, ওই কাপড়কে পূর্ব দিক থেকে টেনে কাজটা করা যায়।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো

কলমের ছায়া	কলমের কোন দিকে ছায়া গঠিত হচ্ছে	তখন টর্চের অবস্থান (কলমের কোন দিকে)
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো		
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়ো		
ক্রমে বড়ো থেকে ছোটো হচ্ছে		
ক্রমে ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে		

ছবিটি দেখো। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো

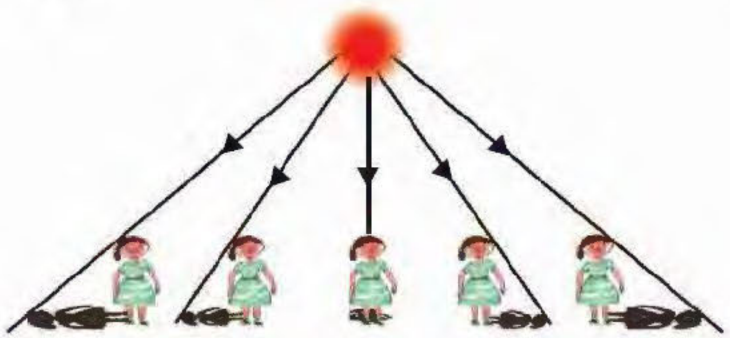

দিদিমণি বললেন— আগের তালিকা দুটি থেকে, তোমার ছায়ার আর কলমের ছায়ার কোনো মিল পাচ্ছ কিনা।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল— হুবহু একরকম দিদিমণি।

দিদিমণি বললেন— ধরো, টর্চটা হলো সূর্য। কলমদানি সহ কলম হলো তুমি। টেবিলটা হলো পৃথিবী। তাহলে ভেবে বলো দেখি তোমার ছায়ার এরকম আচরণের কারণ কী?

রুকসানা বলল— দিদিমণি, এখানে টর্চটা স্থির, তার মানে সূর্যটা স্থির থাকে। আর টেবিলটা সরানো হচ্ছিল। তার মানে পৃথিবীটা গতিশীল। তাই ছায়ার আচরণ ওইরকম হয়।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু একটু পার্থক্য আছে? টেবিলটা টর্চের নীচ দিয়ে সোজাসুজি সরানো হচ্ছে। পৃথিবী কিন্তু সূর্যের সাপেক্ষে সোজাসুজি যাচ্ছে না, ঘুরছে। এবার বলোতো তোমরা সূর্যকে দিনের বেলা দেখতে পাও। রাতে সূর্যকে দেখতে পাও না কেন?

রাহুল বলল— রাত্রে আকাশে তো সূর্যটাই থাকে না। তাহলে রাতে সূর্য কোথায় যায়? সূর্য তো স্থির।

সবাই একসঙ্গে বলল — তাহলে কারণটা কী দিদিমণি?

—কারণটা জানতে হলে এসো আর একটা খেলা খেলি।

দিদিমণি ক্লাসের সবাইকে স্কুলের সামনের দিকে মাঠে নিয়ে গেলেন, তারপর সবাইকে এক এক করে, স্কুলের সামনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু-এক পাক ঘুরতে বললেন।

একবার পুরো পাক দিতে, তুমি স্কুলকে কতবার দেখতে পেলে	স্কুলটাকে কখন দেখতে পেয়েছ	স্কুলটাকে কখন দেখতে পাওনি

এবার দিদিমণি বললেন— তুমি স্কুলটাকে কখনও দেখতে পেয়েছ আবার কখনও দেখতে পাওনি। কারণ- তুমি পাক খাওয়ার সময় স্কুল একবার তোমার সামনে, একবার তোমার পিছনে পড়েছে।

রাখি বলল— দিদিমণি, তাহলে পৃথিবীটাও কি ওইরকমভাবে পাক খায়?

দিদিমণি বললেন— ঠিক ধরেছ রাখি। তুমি পৃথিবীর যেখানে আছ, পৃথিবী পাক খায় বলে সেই জায়গাটা একসময় সূর্যের সামনে এসে পড়ে। তখন তুমি সূর্যকে দেখতে পাও। তখন হয় দিন।

রুকসানা বলল — দিদিমণি, তাহলে পৃথিবী ঘুরছে বলে সেই জায়গাটা আবার সূর্যের উলটো দিকে চলে যায়। তখন আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না। সেটাই রাত্রি তাই না?

দিদিমণি বললেন— ঠিকই বলেছ। দিন-রাত নিয়ে আমরা পরের দিন আরো বেশি করে আলোচনা করব।

পরদিন দিদিমণি ক্লাসে এসে একটা বড়ো ব্যাগ থেকে কিছু জিনিসপত্র বার করলেন। তার মধ্যে রয়েছে একটা বড়ো বল, একটা শক্ত সুতোর রিল, স্কেচ-পেন আর একটা টর্চ।

রাখি বলল— দিদিমণি এগুলো দিয়ে কী হবে?

— আমরা এখন দিনরাত্রি খেলা খেলব। তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন আমার কাছে এসো।

রাহুল দৌড়ে উপস্থিত হলো দিদিমণির কাছে।

দিদিমণি বললেন— বলটার মাঝ বরাবর বলটাকে ঘিরে একলাইনে 'ক' থেকে 'চ' অবধি লিখে ফেলোতো।

দিদিমণি সুতোটা দিয়ে বলটাকে ভালো করে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন (ছবিতে দেখো)।

ঘর পুরো অন্ধকার করে দেওয়া হলো। তারপর দিদিমণি রুকসানাকে বলটার ওপর টর্চের আলো ফেলতে বললেন।

রুকসানা বলটার কিছুটা কাছ থেকে বলটার ওপর ছবির মতো পাশ থেকে টর্চের আলো ফেলল।

দিদিমণি অসীমাকে বললেন— বলটাকে তুমি খুব আস্তে একবার মাত্র লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দাও। খেয়াল রাখো বলটা যেন দোলা না খায়।

অসীমা তাই করল।

দিদিমণি বললেন— সবাই বলটার দিকে লক্ষ রাখো। আর খেয়াল করো বাংলা বর্ণগুলোকে। দেখো কোন কোন বর্ণগুলোর ওপর টর্চের আলো পড়ছে। আর তখন কোনগুলোর ওপর টর্চের আলো পড়ছে না।

রাখি বলল— সবকটা বর্ণ একসঙ্গে আলোকিত হচ্ছে না। একবার বলের একদিকের বর্ণগুলো আলোকিত হচ্ছে, অন্যগুলো তখন অন্ধকারে ঢাকা থাকছে। পরমুহূর্তেই অন্ধকারে থাকা বর্ণগুলো আলোকিত হচ্ছে। আর আলোকিত বর্ণগুলো চলে যাচ্ছে অন্ধকারে। তখন তাদের দেখাই যাচ্ছে না।

দিদিমণি বললেন— পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এমনই হয়। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে পাক খাওয়ার খেলাটা এবার মনে করো। তোমরা জানতে পেরেছ পৃথিবী নিজের চারিদিকে পাক খায়। এর ফলে অর্ধেকটা এক সময়ে সূর্যের দিকে থাকে। তখন সেই জায়গা সূর্যের আলো পায়।

সুজয় বলল— তখন নিশ্চয়ই ওই জায়গায় দিন।

— ঠিক তাই।

শীতল বলল— পৃথিবীর যে জায়গায় দিন হয়, তার উলটো দিকে নিশ্চয়ই রাত হয়। কারণ তখন ওই জায়গায় তো সূর্যের আলো পৌঁছোয় না। তাই ওই জায়গা থাকে অন্ধকার।

সুজয় বলল— ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা ঝলমলে আলো থাকে না কেন?

দিদিমণি বললেন— খুব ভালো ভেবেছ। রাত শেষ হয়ে দিনের শুরু হলো ভোরবেলা। আরেকটু পরে পৃথিবী পাক

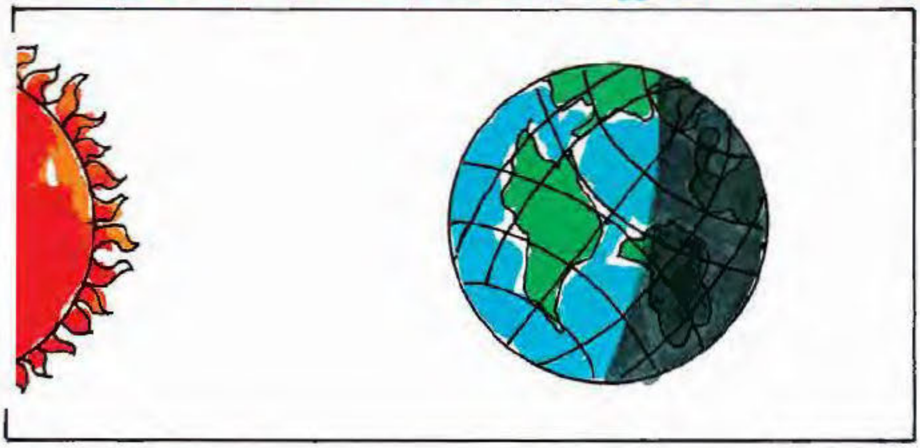

খাওয়ার জন্য তোমার জায়গাটায় হবে সকাল।

এবার শীতল বলল— তাহলে দিন শেষ হয়ে রাতের শুরু হলো সন্ধ্যাবেলা। পৃথিবী পাক খাওয়ার জন্য আমার জায়গায় আরেকটু পরে অন্ধকার হয়ে যাবে।

দিদিমণি বললেন— গরমকালে তুমি যখন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠো, তখন কি ঝলমলে আলো দেখতে পাও?

অসীমা বলল— হ্যাঁ, ভোর পাঁচটার সময় ভালোই রোদ উঠে যায়। কিন্তু শীতকালে ভোর পাঁচটার সময় রীতিমতো অন্ধকারই থাকে। আবছা আবছা আলোর আভাস থাকে।

— তুমি ঠিকই বলেছ। এবার বলো, গরমকালে বিকেলে তুমি বেশি খেলার সময় পাও, না শীতকালে?

রাখি বলল— গরমকাল। তখন প্রায় সাড়ে ছটার পর সন্ধ্যা হয়। কিন্তু শীতকালে ছটাতেই প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। শীতকালে অনেক আগেই সন্ধ্যা নেমে যায়।

— তাহলে ভেবে বলোতো, কোন সময় দিন বড়ো রাত ছোটো- আবার কোন সময় এর ঠিক উলটোটা?

রুকসানা বলল — এ তো সবাই জানে গরমকালে দিন বড়ো আর রাত ছোটো, আর শীতকালে এর ঠিক উলটোটা।

চাঁদ

পরদিন দিদিমণি ক্লাসে একটা চাঁদনি রাতের ছবি দেখালেন। সবাইকে বললেন, ওই ছবিটা দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

সন্ধ্যামণি বলল— কী সুন্দর দৃশ্য! চাঁদের আলোয় সব কিছু কেমন রুপোলি হয়ে উঠেছে।

দিদিমণি— তুমি ঠিকই বলেছ দৃশ্যটা সত্যিই সুন্দর। চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওটাকেই আমরা চাঁদের আলো বলি।

প্রত্যুষ বলল — আচ্ছা দিদি চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ কীসের?

— আমাদের পৃথিবীর মতো চাঁদেও পাহাড় আছে। আর আছে বড়ো বড়ো গর্ত।

আলম বলল— তাহলে ওইগুলোকে দেখতে পাই না কেন?

— দেখতে পাও তো! ওগুলোকেই তোমরা কালো কালো দাগ হিসাবে দেখো। ঘুড়ি যখন অনেক উঁচুতে চলে যায় তখন তাকে কী আর বড়ো দেখায়। ছোটো বিন্দুর মতো দেখায়।

আলম বলল — বুঝতে পেরেছি, চাঁদ পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে থাকায় ওগুলোকে আমরা কালো কালো দাগের মতো দেখি।

— ঠিক তাই। এই দাগগুলোকে আমরা বলি **চাঁদের কলঙ্ক**।

বিপুল বলল— সারা বছরই ওই দাগগুলো চাঁদের গায়ে একই জায়গায় দেখা যায়।

— আসলে আমরা সবসময় চাঁদের একটা পিঠই দেখতে পাই।

আলম বলল — দিদিমণি চাঁদকে সরে সরে যেতে দেখি কেন!

— চাঁদ হলো পৃথিবীর উপগ্রহ। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরছে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে।

প্রত্যুষ বলল— আচ্ছা দিদিমণি, চাঁদকে আমরা নানারকম আকারে দেখি কেন? কখনও গোল রুপোলি থালার মতো। কখনও কাস্তের মতো। কখনও আবার কমলালেবুর কোয়ার মতো।

— চমৎকার প্রশ্ন করেছ। এর উত্তর খুঁজতে চলো আমরা একটা খেলা খেলি।

টেবিলের ওপর একটা বড়ো বল রাখো। বলটা থেকে কিছুটা দূরে একটা টর্চ জ্বালিয়ে রাখো। টর্চের আলো যেন ভালোভাবে বলের উপর পড়তে পারে। ঘর যতটা সম্ভব অন্ধকার করে দাও। এবার একটু দূরে গিয়ে বলটাকে চারপাশ থেকে দেখো।

এবার নানান দিক থেকে তুমি বলটাকে কেমন দেখতে পাচ্ছ তা খাতায় এঁকে ফেলো।

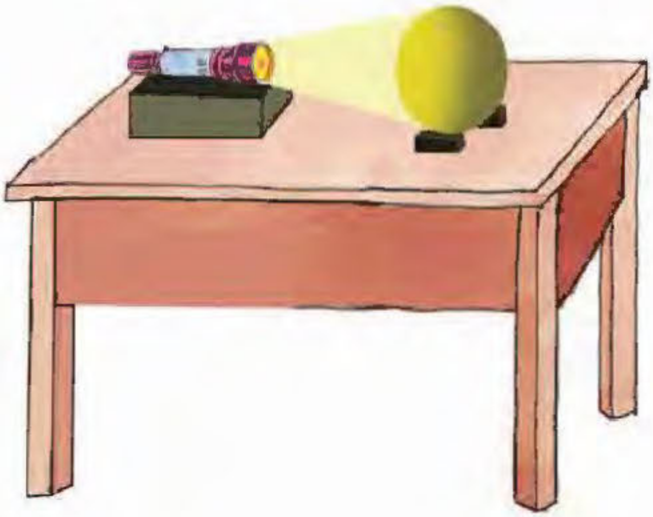

দিদিমণি বললেন— চাঁদ তো পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সূর্যের আলোয় চাঁদের একটা পিঠ সবসময় আলোকিত হয়।

প্রত্যুষ বলল — চাঁদ তো সরে সরে যাচ্ছে তাহলে ওই আলোকিত অংশও নিশ্চয়ই বদলে যাবে।

— বাঃ, ঠিক বলেছ। এমনটাই তো হয়। তাই পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত যে অংশটুকু আমরা দেখি, তা কখনও গোল কখনও কাস্তের মতো আবার কখনও বা কমলালেবুর কোয়ার মতো।

আলম বলল — পূর্ণিমার সময় আমরা চাঁদটাকে গোল থালার মতো দেখি কেন?

— চাঁদের যে দিকটা সূর্যের পুরো আলো পায় , তার পুরোটাই আমরা দেখতে পাই, তখন চাঁদকে ওরকম গোল দেখায় এটাই হলো পূর্ণিমা।

বিপুল বলল— অমাবস্যায় চাঁদকে দেখতে পাই না কেন?

— চাঁদের দিকে তাকালে যে পিঠটা আমরা দেখতে পাই অমাবস্যায় সূর্যের আলো সেই পিঠে পড়ে না। আলোর অভাবে ওই পিঠ আমরা দেখতে পাই না। যদিও চাঁদের উলটো পিঠে তখন সূর্যের আলো পড়ে কিন্তু চাঁদের সেই আলোকিত পিঠ তখন আমাদের চোখের সামনে নেই।

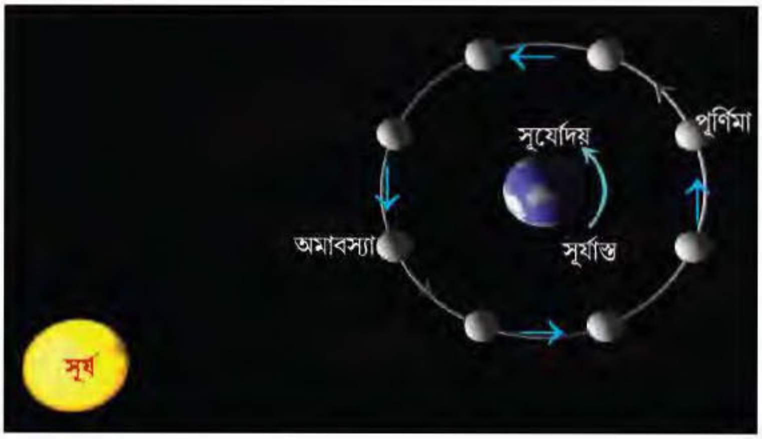

ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

সুশোভন বলল— স্যার বলেছেন কাল সন্ধেবেলায় ক্লাস হবে। কী মজা। রাতের বেলায় বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে থাকতে পারব। কেউ বকবে না।

পরের দিন ঠিক রাত আটটায় আমরা স্কুলের মাঠে হাজির। আকাশটা যে এরকম তারা দিয়ে সাজানো তা তো আগে দেখিনি। আমরা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে। স্যার একটা জোরালো টর্চ জ্বালিয়ে তারা চেনাতে লাগলেন।

ওই দেখো, ওই তারাটা—বলে স্যার টর্চটি জ্বেলে দিলেন। টর্চের আলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছোয় না তা তো আমাদের জানা ছিল। কিন্তু ওই আলোর পথ ধরে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের কোন তারাটি বা তারাগুলো দেখাতে চান তিনি। স্যার বললেন— উত্তর-পূর্ব **দিকে দেখো। কেমন একটা প্রশ্নের চিহ্নর মতো সাজানো আছে** সপ্তর্ষি, **ঠিক যেন এটা প্রশ্ন চিহ্ন।**

হিমাদ্রি বলল— টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা দেখালেন স্যার। ওই হলো ক্রতু, তার পিছনে পুলহ। তারপর পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ আর মরীচি।

— সাতটা তারা মিলিয়ে নাম দেওয়া হলো সপ্তর্ষিমণ্ডল।

রাজীব বলল— বশিষ্ঠের একেবারে গায়ে গায়ে ওই ছোটো মতো ফুটকি তারাটির নাম কী?

স্যার বললেন— **ওর নাম** অরুন্ধতী। **বশিষ্ঠের স্ত্রী।**

সেই শুনে সবার কী হাসি।

অভিষেক জিজ্ঞেস করল— স্যার, ধ্রুবতারা কোনটা?

স্যার টর্চ জ্বাললেন। পুলহ আর ক্রতুর দিকে আলো ফেললেন। বললেন পুলহ আর ক্রতুকে — মানে ওপরের দুটো তারাকে একটা সরলরেখায় রেখে সোজা চলে যাও উত্তর দিকে। ওই দেখো একটা তারা মিটমিট করছে। তার নাম ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষি তো বটেই আকাশের সব তারাই তার জায়গা পালটায়। কেবল ওটাকেই আমরা নড়তে দেখি না।

রুমা বলল— তাই বুঝি ওর নাম ধ্রুব।

মহাকাশ অভিযান ও ভারত

তিতিরের কাকু আবহাওয়া অফিসে কাজ করেন। তিতির শুধু এটুকু জানে যে কাকু কম্পিউটারে ছবি দেখে, আর বুঝতে পারে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া কেমন যাবে। এইতো কদিন আগে একটা বড়ো ঝড় হয়ে গেল বাংলাদেশে। কাকু প্রায় পনেরো দিন আগেই জানতে পেরেছিলেন যে ঝড়টা আসছে।

কাকু বলেন— আগে থেকে আবহাওয়ার খোঁজখবর জানার কাজটা কিন্তু একদিনে এত সহজ হয়নি। বিভিন্ন দেশের অনেক মানুষ বহুদিন চেষ্টা করেছেন তার জন্য।

তিতির বলল— আচ্ছা কাকু, তুমি অফিসের কম্পিউটারে ছবি দেখে কী করে আবহাওয়া বলো?

কাকু বললেন— আমাদের অফিসের কম্পিউটারের পর্দায় পৃথিবীর বাইরে থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি দেখা যায়।

— কিন্তু পৃথিবীর বাইরে তো কেউ নেই। তাহলে কে তুলল ওই ছবি?

— বিজ্ঞানীরা ক্যামেরা বসানো একটা যন্ত্র পাঠিয়েছেন মহাকাশে। তারপর ঘুরিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের মতো করে। একেই কৃত্রিম উপগ্রহ বলে। তাতেই বসানো আছে আরও কত যন্ত্রপাতি।

তিতির তো অবাক; সে জিজ্ঞেস করল— কিন্তু পৃথিবীর বাইরে নিয়ে গেল কী করে এত সব কিছু?

— তুমি তো জানো, কোনো জিনিস ওপর দিকে ছুঁড়লে আবার মাটিতে ফিরে আসে। তাই রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল ওইসব যন্ত্রপাতি মহাকাশে পাঠাতে।

তিতির বলল— আমি জানি, মানুষ চাঁদেও গেছে। কিন্তু মানুষ চাঁদে যাবার কথা ভাবল কেন?

তখন কাকু একটা গল্প বললেন— প্রাচীনকাল থেকে মানুষ দেখে এসেছে আকাশের বুকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আমাদের দেশের আর্যভট্টও জানতেন, পৃথিবী নিজের চারপাশে পাক খায়, তাই দিন ও রাত হয়। কিন্তু দূরবিন আবিষ্কার হয় মাত্র চারশো বছর আগে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি নিজেই তৈরি করে ফেলেন একটা দূরবিন। তার সাহায্যেই পৃথিবী থেকে অনেক দূরের বৃহস্পতি গ্রহকে দেখতে পান। আর দেখতে পান বৃহস্পতি গ্রহের বারোটার মধ্যে চারটে উপগ্রহকে। এরপর থেকেই মানুষ মহাকাশ নিয়ে আরও গবেষণা শুরু করে। এই গ্যালিলিওই প্রথম দেখান যে চাঁদ পৃথিবীর মতোই অসমান, গভীর খাদে ভরা একটা পাথুরে কঠিন বস্তু।

পাশের ছবি দেখে তোমরা কি বুঝতে পারছ যে আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের একটা অংশমাত্র।

আমাদের সৌরজগতে সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহগুলো কেমনভাবে আসে তা পাশের ছবিতে দেখো। ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো।

কেমন গ্রহ	গ্রহদের নাম
(ক) সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকা গ্রহ	
(খ) সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ	
(গ) বলয় আছে এমন গ্রহ	

তিতির বলল— এরপরই তাহলে মানুষ চাঁদে যাওয়ার কথা ভাবে?

— মানুষ প্রথমেই নিজে মহাকাশে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। কারণ ফিরে আসতে পারা যাবে কিনা সেটা তো নিশ্চিত ছিল না। তাই পাঠানো হলো একটা কুকুরকে,তার নাম ছিল লাইকা। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ যেতে শুরু করে। চাঁদের বুকে প্রথম পা দেন, নীল আর্মস্ট্রং। আমাদের দেশ থেকে প্রথম মহাকাশ অভিযানে যান রাকেশ শর্মা। এখন তো শুধু চাঁদ নয়, মঙ্গল গ্রহের বুকে নেমেছে সন্ধানী যান— কিউরিওসিটি। শনিগ্রহের সন্ধানে গেছে ক্যাসিনি।

— আমাদের দেশ থেকে কিছু পাঠানো হয়নি মহাকাশে?

কাকু বললেন— শুরুতেই আমরা পারিনি। এখন আমরা নিজেদের দেশেই তৈরি 'চন্দ্রযান' পাঠাতে পেরেছি চাঁদে। মঙ্গলেও অভিযানের পরিকল্পনা চলছে।

— যে সমস্ত যন্ত্রপাতি পাঠানো হয় সেগুলোর কী কাজ?

— সেগুলোর কোনোটা মাটি পরীক্ষা করে, কোনোটা জল বা ধাতুর সন্ধান করে, আবার কোনোটা সেখানকার আবহাওয়ার খোঁজখবর নেয়।

— আর যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলো পাঠানো হয়েছে, সেগুলো আবহাওয়ার খবর পাঠানো ছাড়া আর কী করে?

— আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলি। আমাদের দেশের পাঠানো ইনস্যাট নামের অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ এ কাজে সাহায্য করছে।

— ও, তাহলে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময়েও ওগুলোর সাহায্য নিতে হচ্ছে।

— ঠিক তাই। তাছাড়াও বিদেশে খেলা হচ্ছে, আর তুমি টাটকা খেলা দেখছ। খবর দেখছ টিভিতে বা ধারাভাষ্য শুনছ রেডিয়োতে। সবই তো এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।

ছবি দেখে বা নিজেদের কল্পনায় কাগজ বা পিচবোর্ড বা থার্মোকল কেটে নকল উপগ্রহের মডেল তৈরির চেষ্টা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বাঁচার জন্য জল

আজকে পাড়ার রাস্তার জলের পাইপ সারানো হচ্ছে। সারাদিন জলের টানাটানি। ক্লাসে গিয়ে রীনা রিজিয়াকে বলল— 'হ্যাঁরে, তোদের কলে আজ জল এসেছে?

রিজিয়া বলল — না, বিকেলে আসবে।

দিদিমণি কী করে যেন শুনতে পেলেন! রিজিয়াকে বললেন— জল প্রকৃতির দান। জল না থাকলে সত্যিই খুব অসুবিধে হয়।

রাজীব বলল — আজ রাস্তায় একটা বোর্ড দেখলাম। তাতে লেখা - 'জল নষ্ট করবেন না। জলের আর এক নাম জীবন।'

দিদিমণি বললেন — তোমরা কোন কোন কাজে জল ব্যবহার করো?

রুকসানা বলল — খাওয়া, রান্না করা, স্নান করা, কাপড় কাচা এসব কাজে জল ব্যবহার করি।

দিদিমণি বললেন — পানীয় জল হলো সবচেয়ে দরকারি। বাসস্থানের কাছাকাছি জল থাকলে সুবিধে। তাই অনেক আগে থেকেই মানুষ ঝরনা, নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকতে শুরু করেছিল। জলের কাছাকাছি থাকলে কী সুবিধে বলতে পারো?

— জলপথে আসা-যাওয়া করতে পারব। মাছ ধরতে পারব। ক্ষেতে জল দিতে সুবিধে হবে।

— হ্যাঁ। ঠিক তাই। এজন্য মানুষ এক সময় হ্রদে বা জলাশয়ে মাচা তৈরি করে থাকত। মানুষ দেখেছিল — ক্ষেতে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা না করলে গাছ মরে যায়।

মানিক বলল — বাড়ির কাছে নদী থাকলে বেশ নৌকো চালানো যায়।

দিদিমণি বললেন — নদীর ধারে বড়ো বড়ো জনবসতি গড়ে ওঠার একটা প্রধান কারণ এটাই। নদীতে ভেলা বা নৌকোর সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শস্য, কাঠ, পাথর এবং আরো জিনিস বয়ে নিয়ে যেত। এইভাবে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ব্যাবসাবাণিজ্যের আস্তে আস্তে উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু নদীর ধারে থাকার বিপদ কী বলোতো?

— বারেবারে বন্যা হবার ভয়।

অরুণ বলল — তাহলে তো দিদি তখনকার মানুষকেও বন্যা থেকে বাঁচার কথা ভাবতে হয়েছিল।

দিদিমণি বললেন — মানুষ প্রথমে নদীর উপর মাটির বাঁধ দিয়েছিল। পরে তাকে আরো নানাভাবে শক্তপোক্ত করেছিল। তারপর একসময় নদীতে সিমেন্টের পাকা বাঁধ দিল। তবে মানুষ এও দেখেছিল বন্যার জল সরে গেলে কৃষিজমিতে পলিমাটি থিতিয়ে পড়ে। এতে ফসল ভালো হয়।

বাড়ি ফেরার পর ক্লাসে জল নিয়ে ওদের আলোচনা শুনে আরতির দাদু বললেন — জল না হলে পৃথিবীতে প্রাণই সৃষ্টি হতো না। এখন পর্যন্ত জানা গেছে একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই প্রাণ আছে। তার একটা বড়ো কারণ পৃথিবীতে জল আছে। জলেই প্রথম গাছ ও প্রাণীর জন্ম হয়েছিল।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জল নিয়ে নীচে লিখে ফেলো।

তোমার বাড়ি কোন জায়গায় (গ্রামে/শহরে)	
তোমার বাড়ির ব্যবহারের জল কোথা থেকে পাও	
কোন সময়ে জলের সমস্যা হয়	
তখন তোমরা কী করো	
বর্ষার জলকে কী করে ব্যবহার করা যায়	

আগুনের ব্যবহার

দিদিমণি ক্লাসে আসতেই সালাম বলল — একটা কথা বলব দিদি?

দিদিমণি বললেন — কী ব্যাপার সালাম? কী বলবে?

সালাম বলল — জানেন দিদি, কাল আমি আগুন আবিষ্কার করে ফেলেছি।

সবাই শুনল।

পলাশ বলল — আরে আগুন তো নানা কিছু থেকেই পাওয়া যায়। তুই কী করে আবিষ্কার করলি? দেশলাই দিয়েই তো আগুন জ্বালানো যায়।

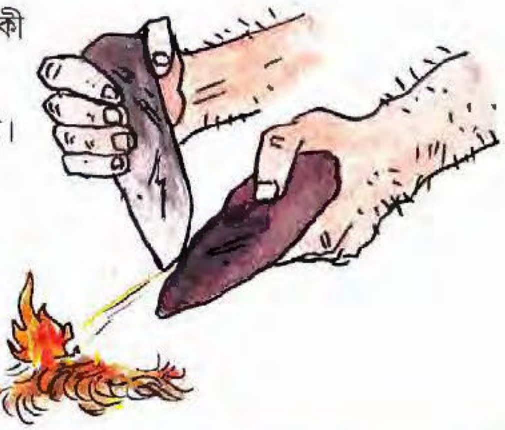

সালাম বলল — আরে না। কাল আমি কয়েকটা পাথর নিয়ে খেলছিলাম। হঠাৎ দুটো পাথরে ঠোকাঠুকি করতে আগুনের ফুলকি বেরোলো।

দিদিমণি বললেন — ওগুলো তাহলে চকমকি পাথর হয়তো। ওভাবেই একসময় মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল আগুন।

রাবেয়া বলল — তাহলে সালামের আগেই আগুন আবিষ্কার হয়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন — সে হোক। তবু সালামও আগুন আবিষ্কার করেছে। এই যে ও নিজে হাতে জিনিসটা করল এটাই আসল।

অরুণ বলল — আচ্ছা দিদি, একসময় তো আগুনের ব্যবহার মানুষ জানত না?

দিদিমণি বললেন — ঠিক তাই। তখন তারা আগুনের সুবিধাও পেত না। ঠান্ডায় কষ্ট পেত। অন্ধকারে থাকত। কাঁচা খাবার খেত।

সালাম বলল — তারপর যখন আগুন আবিষ্কার করে ফেলল তখন?

দিদিমণি বললেন — তখন তো অনেক কিছুই বদলে গেল। আগুন জ্বেলে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচল। আজও দেখবে খুব শীতে লোকে আগুন পোহায়। মানুষও অনেকদিন আগে তেমন আগুন পোহাত।

রানি বলল — তখন কি রান্না করে খেতে শিখল মানুষ?

— এখন যেমন রান্না করা হয় তেমনটা পারত না। কিন্তু আগুনে খাবার ঝলসে নিত।

বিশু বলল — আমরা যেমন বেগুন-আলু এসব পোড়া খাই?

— একদম তাই। ঝলসে নিলে খাবার নরম হয়ে যেত। আগুনে ঝলসালে খাবারের জীবাণুও মরে যেত। আর সেগুলো হজম করাও সহজ হতো। এরফলে মানুষের শরীরে নানারকম বদল ঘটতে শুরু হলো। আর কাঁচার থেকে ঝলসানো, পোড়া খাবার খেতেও ভালো।

রানি বলল — দিদি, আগুন তাহলে শীত থেকে বাঁচাল। আগুনে খাবার ঝলসে খেতে শুরু করল মানুষ। আর কী কাজে লাগল আগুন?

দিদিমণি বললেন — আগুনকে সব পশু-পাখি ভয় পায়। মানুষ বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচতে আগুনের ভয় দেখাত। আগুন থেকে আলো হয়। তা দিয়ে অন্ধকারেও চলাফেরা করা যায়। আর আগুন নানা কিছু পোড়ায়। পোড়াবার ফলে অনেক কিছু শক্ত হয়। অনেক কিছু আবার গলে যায়।

অরুণ বলল — দিদি, মাটি পোড়ালে শক্ত হয়। তাই কুমোরপাড়ায় মাটির হাঁড়ি, কলশি বানিয়ে পুড়িয়ে নেয়।

সালাম বলল — লোহা আগুনের তাপে গলে যায়। কামারশালায় লোহা আগুনে নরম করে পিটতে দেখেছি।

দিদিমণি বললেন — বাঃ ! বেশ খেয়াল করে দেখেছ তো! আগুনে পোড়ালে মাটির পাত্র সহজে ভাঙে না, নষ্ট হয় না। তাছাড়া পোড়া ইট ব্যবহার করত মানুষ বাড়ি বানাবার জন্য। আর পোড়ামাটির খেলনা, গয়নার কথা তো তোমরা জানোই। কাচ তৈরি করতেও আগুন লাগে।

বিশু বলল — আমার মামার বাড়ি বিষ্ণুপুরে। সেখানে মন্দিরও পোড়ামাটির তৈরি।

দিদিমণি বললেন — আগুন ব্যবহার করতে শেখার পর মানুষের জীবনযাত্রা বদলে গেছিল। আগুনকে তাই পুরোনো দিনের মানুষ ভক্তি করত। আবার আগুনের ধ্বংস করার ক্ষমতার বিষয়েও তারা সচেতন ছিল। তাই তারা ভয়ও পেত আগুনকে। মানুষের রোজকার বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছিল আগুন।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষের কী কী উপকার হয়েছিল তা নিয়ে নীচে লিখে ফেলো।

নানা কাজে আগুনের ব্যবহার	আগুনের ব্যবহারের আগে	আগুনের ব্যবহারের পরে
খাবার		
বাসস্থান		
নিরাপত্তা		
প্রতিদিনের কাজে		

গাছ আমাদের প্রাণ

সামনেই অরণ্যসপ্তাহ। স্কুলের মাঠে সবাই একেকটা গাছ পুঁতবে। কে কী গাছ পুঁতবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ক্লাসে। করবী বলল আমি একটা নয়নতারা গাছের চারা আনব। রেহান বলল আমি আনব সবেদার চারা। কুহেলী অশ্বত্থের চারা আনবে। সমীরের বাড়ি নদীর বাঁধের খুব কাছে। গতবারের বন্যায় মাটি অনেক ধুয়ে গেছে। তাই সেখানে গেঁওয়া আর সুন্দরীর চারা পোঁতা হয়। আর তমাল আনবে বলল মেহগনি চারা।

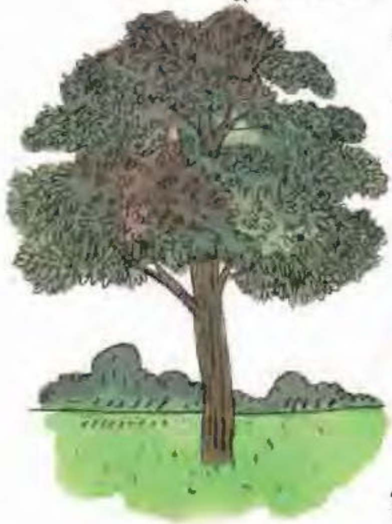

দিদিমণিকেও আলোচনার কথা জানাল ওরা।

দিদিমণি বললেন— ঘরবাড়ি বানানো মানুষ যখন শেখেনি, গাছই ছিল তার থাকার জায়গা। কখনো- কখনো গাছের ওপর মাচা বেঁধেও থাকত।

তমাল বলল— থাকার কাজ ছাড়াও তো গাছ মানুষের নানা প্রয়োজনে লাগে।

—হ্যাঁ। কোনো গাছ থেকে ঔষধ পাই। আবার কোনো গাছ থেকে খাবার পাই। গাছের নামে কতো জায়গার নাম হয়। হিংস্র পশুদের থেকে বাঁচার জন্য গাছের শক্ত ডাল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

এবার আলোচনা করে এমন পাঁচটি গাছের নাম বলো যাদের ডাল খুব শক্ত।

১। .... ২। .... ৩। .... ৪। ....
৫। ....

দিদিমণি বললেন — কৃষিকাজ শেখার পর গাছের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল। মানুষ গম, যব, ধানের বীজ জমিয়ে রাখতে শিখল। নানা গাছের চারা পুঁতে তাদের বাঁচিয়ে রাখার ভাবনাও এল।

রীতার দাদুর সেবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। ডাক্তারজেঠু ওনাকে তেতো ট্যাবলেট খেতে দিলেন। রীতা ডাক্তারজেঠুর কাছ থেকে জানল — এই জ্বর সারানোর ওষুধ নাকি কোনো একটা গাছের ছাল থেকে তৈরি হয়। এরকম অনেক গাছ আছে যাদের মূল, কাণ্ড বা পাতা ওষুধ তৈরির কাজে লাগে।

এবার তোমরা বন্ধুদের, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো।

গাছের নাম	মানুষের জীবনে কী কী কাজে লাগে
ধান	
বাঁশ	
পাট	
তুলসী	

পোষ মানা পশু- পাখি

রুমা, সহেলি ও আফসানারা খরগোশ পুষেছে। রোজ তাদের কচি ঘাস এনে খাওয়ায়, যত্ন করে। অরুণের একটা ছোটো কুকুর আছে। স্কুলে এসে সেসব নিয়ে ওদের গল্প হচ্ছিল।

রুমা বলল — আগেকার মানুষও কি আমাদের মতো পশু-পাখি পুষত, তাদের যত্ন করত?

দিদিমণি বললেন — আগেকার মানুষ প্রথমেই পশুকে পোষ মানাতে পারেনি। তারা শিকার করে পশুর মাংস খেত।

রীনা জিজ্ঞেস করল— কী কী জন্তু শিকার করত?

দিদিমণি বললেন — এক এক জায়গায় এক এক রকমের পশু শিকার করত। কোথাও লোমওয়ালা হাতি। কোথাও আবার বলগা হরিণ। কোথাও বা আবার বুনো শুয়োর।

অরুণ জিজ্ঞাসা করল — তাহলে জন্তুকে পোষ মানাল কেন?

— মানুষ বুঝতে পেরেছিল পশুকে পোষ মানালে অনেক সুবিধা। সারা বছর ধরে মাংস, দুধ আর চামড়া পাওয়া যাবে। তবে কুকুরকে এসবের জন্য পোষ মানানো হয়নি, হয়েছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ।

এবার তোমরা বিভিন্ন পশু কী কী কাজে লাগে তা লেখো।

কুকুর	ছাগল	গোরু	ঘোড়া

আফসানা বলল— মানুষ পাখিকে কেন পোষ মানাল?

— হাঁস, মুরগির মতো পাখিদের পোষ মানিয়েছিল সারা বছর ধরে ডিম ও মাংস পাবার জন্য। তবে অনেক পাখিকে মানুষ নিজের অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহার করত। পায়রাকে খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজে ব্যবহার করত।

এসব শুনে জন বলল— দিদি, তাহলে পশুপাখি ছাড়া মানুষের চলত না, বলুন?

দিদিমণি বললেন— মানুষের জীবনে পশুপাখিদের গুরুত্ব আস্তে আস্তে বেড়েছিল। তখন মানুষ তাদের দলের চিহ্ন হিসেবে পশুপাখির ছবি বা মূর্তি ব্যবহার করত। কোথাও সিংহ, বাঘ, ভালুক, ষাঁড়, হরিণ। আবার কোথাও নেকড়ে, বাজপাখি বা শকুন।

— পশুপাখিদের নিয়ে মানুষ অনেক কিছু করেছে। কিন্তু গল্প কি লেখেনি?

দিদিমণি বললেন —হ্যাঁ। কত গল্পই না লিখেছে। নানা লোককথা, উপকথায় এরকম নানা পশুপাখির কথা বলা হয়েছে।

যন্ত্রের নানা কাজ

এসো নীচের ছবিগুলি দেখো। ওই ছবিগুলির মধ্যে কোনগুলি তোমাদের বাড়িতে রোজ ব্যবহার হয় — তা লেখো।

টিউবওয়েল

তালাচাবি

ঘড়ি

সাঁড়াশি

স্টোভ

হাতুড়ি

কোদাল

ছুঁচ

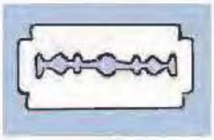
ব্লেড

ছুরি

কোন কোন যন্ত্র তোমাদের বাড়িতে ব্যবহার হয়	কোন কোন কাজে ব্যবহার হয়

তিমির বলল — আচ্ছা বাড়ির বাইরেও তো আমরা নানাধরনের যন্ত্রকে কাজে লাগাই।

দিদিমণি বললেন—ধরো খুব উঁচু গাছের মগডালে একটা আম ঝুলছে। তোমরা সেটা পাড়তে চাও। কীভাবে পাড়বে?

অরুণ বলল — বাপ্পা তো ঢিল ছুঁড়ে পেড়ে ফেলবে। ওর হাতের দারুণ টিপ।

দিদিমণি বাপ্পাকে ডাকলেন। বললেন — হাতের টিপ থাকা ভালো। কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে ফল পাড়া ঠিক নয়। ফসকে গিয়ে ঢিল কারো মাথায় পড়তে পারে। কেউ জখম হতে পারে।

রানি বলল — সব থেকে ভালো আঁকশি বা লগি দিয়ে পেড়ে নেওয়া।

দিদিমণি বললেন — আমাদের যদি জিরাফের মতো লম্বা গলা থাকত। তাহলে আর লগি, আঁকশি, ঢিল কিছুই লাগত না।

সুভাষ বলল — বানরের মতো লাফ দিয়ে গাছে চড়তে পারলেও মিটে যেত। গাছে গাছে ঘুরে মগডালের ফল খেয়ে বেড়াতাম।

দিদিমণি বললেন — এই যে দেখো। মানুষের জিরাফের মতো লম্বা গলা নেই। আবার বানরের মতো লাফাতেও পারে না মানুষ। অথচ গাছের মগডালের ফল পেড়ে নিতে পারে।

সালাম বলল — মানুষের যে বুদ্ধি আছে দিদি। বানর, জিরাফের থেকে মানুষের বুদ্ধি যে অনেক বেশি।

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। ঠিক তাই। বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ কঠিন কাজ সহজে করে নেয়। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে। সেই যন্ত্রপাতিকে ইংরাজিতে বলে Tool (টুল)। সেইসব টুল দিয়ে অনেক কাজ সহজেই করে ফেলতে পারে মানুষ। যেমন, লগি বা আঁকশি একটা টুল। তা দিয়ে গাছে না উঠেই সহজে ফল পেড়ে নেওয়া যায়।

রাবেয়া বলল — এমন তো অনেক টুল আছে দিদি। রোজ আমরা এমন অনেক কাজ করি টুল দিয়ে।

সালাম বলল — টিনের কৌটোর ঢাকনা সহজে খোলা যায় না। চামচের হাতল দিয়ে ঢাকনার ধারে চাপ দিলে খুলে যায়। তাহলে চামচও একটা টুল?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ তো। রোজ দিন এমন অনেক টুল নানা কাজে আমরা ব্যবহার করি।

সুভাষ বলল — আচ্ছা দিদি, টুলগুলো কী দিয়ে তৈরি হতো?

পরিমল বলল — কেন দেখিসনি লোহা, স্টিল এসব দিয়েই তো তৈরি হয়।

রাবেয়া বলল — তবে কাঠ দিয়েও বানানো হয় অনেক কিছু। যেমন, আঁকশির কথাই ধর না।

দিদিমণি বললেন — সবসময় এসব দিয়েই যে মানুষ টুল বানাত তা নয়। খুব পুরোনো দিনে পাথর দিয়ে টুল বানাত মানুষ। কারণ তখন তারা কেবল পাথরের ব্যবহারই জানত। তাছাড়া পশুর হাড় দিয়েও কিছু টুল বানাত। যেমন, ধরো ছুঁচ। তোমরা তো স্টিলের ছুঁচ দেখো। মানুষ অনেক দিন আগে পশুর হাড় দিয়ে ছুঁচ বানাত।

অরুণ বলল — হাতিয়ারও কি পাথর দিয়ে বানাত, দিদি?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। প্রথমে ভোঁতা বড়ো পাথরই ছিল মানুষের হাতিয়ার। তারপর নানাভাবে পাথরকে হালকা, ছুঁচালো ও ধারালো করে নিত তারা। সেই পাথরই ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার। তার অনেক পরে ধাতুর ব্যবহার শেখে মানুষ। ধাতু মানে তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এইসব।

ফুলমণি বলল — হাতিয়ারও কী টুল, দিদি?

দিদিমণি বললেন — না, টুল হলো ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি। আর হাতিয়ার হলো অস্ত্রশস্ত্র। হাতিয়ার দিয়ে পশুদের থেকে নিজেকে বাঁচাত মানুষ।

সুভাষ বলল — আমরাও তো তাহলে নানরকম টুল ব্যবহার করি দিদি।

দিদিমণি বললেন — করিই তো। রোজ নানা কাজে নানারকম টুল ব্যবহার করি। তাতে শ্রম ও সময় দুইই বাঁচে। সেই পুরোনো দিন থেকেই মানুষ টুল ব্যবহার করত। তাতে কম সময়ে সহজে নানা কাজ করা যেত। তারপর থেকে নানাভাবে টুলের উন্নতি করেছে মানুষ।

এবার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল টুল ব্যবহার করি তার কোনটা কী দিয়ে বানানো হয় এসো তা লেখার চেষ্টা করি।

ক্রমিক নং	টুল	কী দিয়ে তৈরি	কী কাজে লাগে
১।	চামচ		
২।	কোদাল		
৩।	লগি/আঁকশি		
৪।	সাঁড়াশি		
৫।	হামানদিস্তা		
৬।	কাঁচি		

পাথরের ব্যবহার

রঞ্জুর কাছে নানারকম পাথর আছে। ও পাথর জমাতে ভালোবাসে। একদিন ক্লাসে সবাইকে পাথরগুলো দেখাতে নিয়ে গেল। দিদিমণিও দেখলেন।

দিদিমণি বললেন— পাথর মানুষের নানা কাজে লাগে।

অঞ্জু বলল— পাথর দিয়ে শিলনোড়া তৈরি হয়।

মানিক বলল— রেললাইনে পাথর দেয়, দেখিসনি?

পলাশ বলল— মূর্তি বানায় পাথর দিয়ে।

ওদের আলোচনা শুনে দিদিমণি বললেন — মানুষ গুহাতে থাকার সময় থেকেই পাথর ব্যবহার করত। হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াইতে চারপাশে পড়ে থাকা পাথরই ছিল তাদের হাতিয়ার।

আফতাব বলল — কীভাবে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত?

— পাথর ভেঙে তৈরি মোটামুটি তিনকোনা আকৃতির টুকরো দিয়ে তৈরি করত হাতকুঠার। আবার পাথরের ধারালো টুকরো দিয়ে মাংস থেকে চামড়া ছাড়ানো হতো। পাথরের তৈরি তির বা বর্শার ফলা শিকার করতে সাহায্য করত। আস্তে আস্তে পাথরের হাতিয়ার আরো হালকা ও ধারালো করা হলো।

সোমা বলল — হাতিয়ার তৈরি করা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগত না পাথর?

— হ্যাঁ, আগুন জ্বালাতে চকমকি পাথর লাগত। দুটো চকমকি পাথরে ঘষা লাগলে আগুনের ফুলকি তৈরি হয়।

অঞ্জু বলল – দিদি, আমারও রঙিন পাথর কুড়োতে খুব ভালো লাগে।

দিদিমণি বললেন — এরকম নানা রঙের সুন্দর পাথরের টুকরো দিয়ে পুরোনো দিনের মানুষ পাথরের তৈরি মালা ব্যবহার করত। আজও আমরা নানাভাবে পাথরের ব্যবহার করি। তাছাড়া ঘরবাড়ি বানাতেও পাথরের ব্যবহার হতো।

এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তোমরা নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

পুরোনো দিনের মানুষ কীভাবে পাথর ব্যবহার করত	এখনকার মানুষ কীভাবে পাথর ব্যবহার করে

ধাতুর ব্যবহার

রেহানা বলল— তাহলে লোহার ব্যবহার করতে মানুষ কখন শিখল?

দিদিমণি বললেন — সে তো শিখেছে অনেক পরে। তবে আগে তামার ব্যবহার শিখেছিল। তামা, লোহা, কাঁসা সবই ধাতু। বলোতো ধাতু আলাদা করে চেনা যায় কীভাবে?

রুকসানা বলল — কিছু দিয়ে পিটলে 'ঠং ঠং' করে আওয়াজ হয়।

দিদিমণি বললেন — ঠিক, আর কোনো উপায় আছে ধাতুদের চেনার?

সুনীল বলল — হ্যাঁ, বেশ চকচক করে, আর গরম করলে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়।

দিদিমণি বললেন — তাই বুঝি? তুমি জানলে কী করে?

সুনীল বলল — চায়ের কেটলি বা রুটি সেঁকার চাটু উনুনে বসাবার একটু পরেই গরম হয়ে যায়।

নীচে বিভিন্ন ধাতুর নাম লেখা আছে। এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

ধাতুর নাম	চারপাশে দেখা ধাতুর তৈরি জিনিসের নাম	কী কাজে লাগে
সোনা		
তামা		
লোহা		
কাঁসা		
পিতল		
অ্যালুমিনিয়াম		
স্টেনলেস স্টিল		
রুপো		

দিদিমণি বললেন— মানুষের প্রথম কাজের ধাতু হলো তামা। আজ থেকে অনেক আগে মানুষ প্রকৃতিতে তামা খুঁজে পায়। তখনও কিন্তু লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, স্টেনলেস স্টিলের কথা তখনও অজানা।

রুবী প্রশ্ন করল— তামা কী খুব শক্ত ধাতু?

— শক্ত ঠিকই কিন্তু লোহার মতো শক্ত নয়। প্রকৃতিতে যে তামা পাওয়া যেত তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মানুষ খুব দরকারি দুটো জিনিস তৈরি করেছিল। তার একটা হলো লাঙল আর অন্যটা হলো কাস্তে। তামা দিয়ে বাসনপত্র, কাস্তে তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু ঢাল - তরোয়াল বা ভারী কাজের যন্ত্র কিছুই তামা দিয়ে করা যাবে না।

অরুণ জানতে চাইল— লোহা এল কবে?

দিদিমণি বললেন — প্রথমে লোহাকে পায়নি। লোহার আগে তৈরি করেছিল ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ হলো তামা আর টিনের মিশ্রণ। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত, অথচ তামার চেয়ে সহজে গলে যায়। এতে মানুষের চাষের যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির খুব সুবিধে হলো। আমাদের দেশেরও পুরোনো দিনের তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি গয়না, খেলনা ও মূর্তি পাওয়া গেছে। এরপর একসময় মানুষ পৃথিবীতে এসে পড়া উল্কাখণ্ড থেকেই লোহাকে খুঁজে পায়।

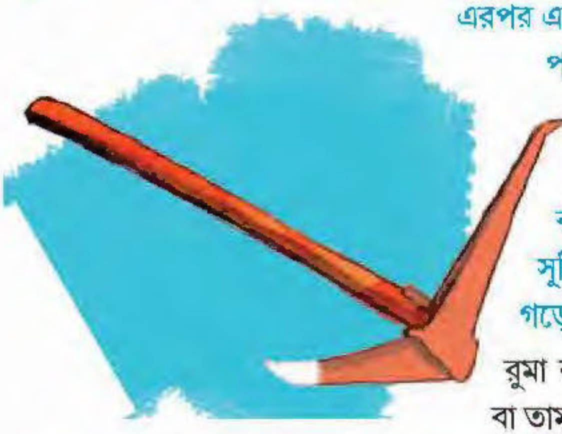

ক্লাসের সবার জানার ইচ্ছে হলো— লোহার জিনিসের কী কী সুবিধে?

দিদিমণি বললেন — লোহার জিনিস শক্ত, ব্রোঞ্জের চেয়ে ধারালো করা যায়। বহুদিন ধরে ধার থাকে। এতে মানুষের নানান কাজে খুব সুবিধে হলো। চাষের জমি আরও বাড়ল, জঙ্গল কেটে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে লাগল।

রুমা বলল— কিন্তু আমাদের হাঁড়ি-কড়া-থালা-বাটি সেগুলো তো লোহা বা তামার তৈরি নয়?

দিদিমণি বললেন— লোহার অনেক গুণ আছে ঠিকই। কিন্তু লোহার একটা মস্ত অসুবিধে হলো তাতে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেস স্টিলে মরচে ধরে না। গলানো লোহার সঙ্গে কিছু কিছু পদার্থ মিশিয়ে তৈরি হয় নানারকম ইস্পাত। বাড়ি, ব্রিজ, যানবাহন তৈরিতে, কৃষিকাজে, নানা যন্ত্রপাতি তৈরিতে ইস্পাত কাজে লাগে। যদিও আমরা সাধারণ কথায় বলি, লোহার রড, আসলে কিন্তু ওগুলো ইস্পাতের তৈরি।

নীচের ছবিতে ইস্পাতের তৈরি নানা জিনিসগুলোকে চিনে পাশে লেখো।

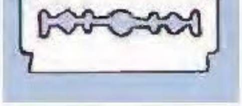

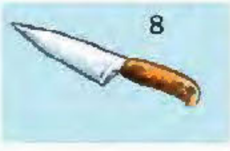

৫

১। ....।
২। ....।
৩। ....।
৪। ....।
৫। ....।

প্রতিদিনের কাজে চাকা

ডমরুর আজ স্কুলে ঢুকতে একটু দেরি হলো। ওর সাইকেলের চাকায় টাল হয়েছিল। সারাতে সময় লাগল। দিদিমণি রাগ করলেন না। বললেন, মাঝেমধ্যে এরকম হতে পারে। কিন্তু চাকা ছাড়া তো গাড়ি চলবেই না। চাকা তো আমাদের বন্ধু।

দিদিমণি আরও বললেন— চাকা আমাদের প্রতিদিনের নানা কাজে লাগে।

আনোয়ার বলল — মানুষ কীভাবে চাকা তৈরি করা শিখল?

— মানুষ এক দিনে হঠাৎ করে চাকা তৈরি করতে পারেনি। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে চাকা তৈরি করেছে।

সুজয় বলল — কী ধরনের প্রয়োজন?

দিদিমণি বললেন— কোনো কিছু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া ছিল কঠিন।

পলাশ বলল— চাকার ব্যবহার জানলেই কি সব কাজ সহজে করতে পারত মানুষ?

রাবেয়া বলল— তাহলে চাকার ভাবনা কীভাবে এল মানুষের মাথায়?

দিদিমণি বললেন— এটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। হয়তো পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। তার থেকে মাথায় এসেছিল চাকার ধারণা।

নীচের ছবি দুটি ভালো করে দেখো। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে লেখো।

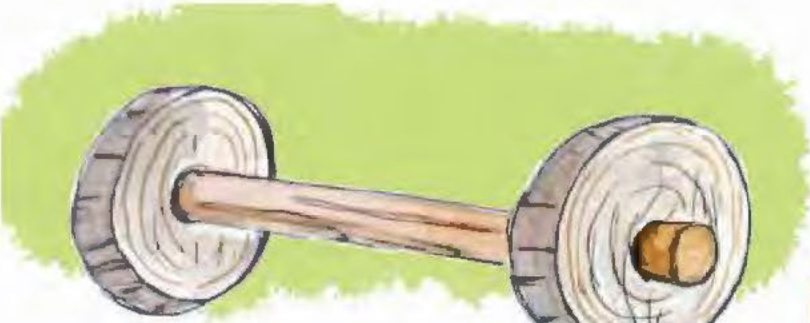

প্রথম ছবি

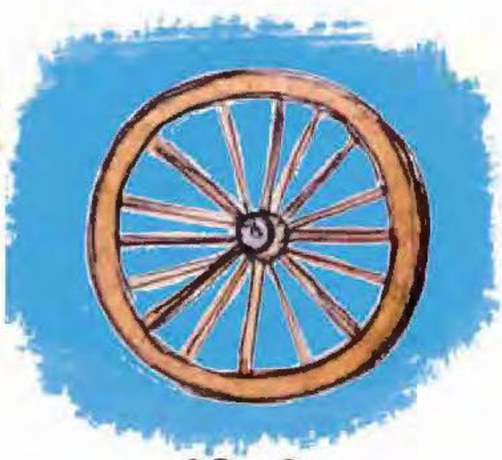

দ্বিতীয় ছবি

চাকার বিষয়	প্রথম ছবি	দ্বিতীয় ছবি
১। ওজন		
২। সুবিধা		
৩। অসুবিধা		

রানি বলল— প্রথমে কী দিয়ে চাকা বানাত মানুষ?

দিদিমণি বললেন— প্রথমে কাঠ দিয়েই চাকা বানাত। গাছের গুঁড়ি গোল করে কেটে চাকা তৈরি করত। তারপর পাথরের চাকাও হতো।

তিতির বলল — দিদি, কাঠের চাকা ভেঙে যেত না?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। ভেঙে যেত। পচেও যেত। একসময় মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। এরপর চাকাকে শক্তপোক্ত করার জন্য লোহার বেড় দিয়েছিল।

ডমরু জিজ্ঞেস করল — বাসে, মোটরেতে রাবারের টায়ার লাগায় দিদি?

— রাবারের চাকা তৈরি হওয়া শুরু হলো অনেক পরে। তাতে হাওয়া ভরা হলো। এতে চাকা হালকা হলো। ঝাঁকুনি কমল। গাড়ি তাড়াতাড়ি চলতেও শুরু করল।

কত কাজেই না লাগে লাঠি

নীচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো:

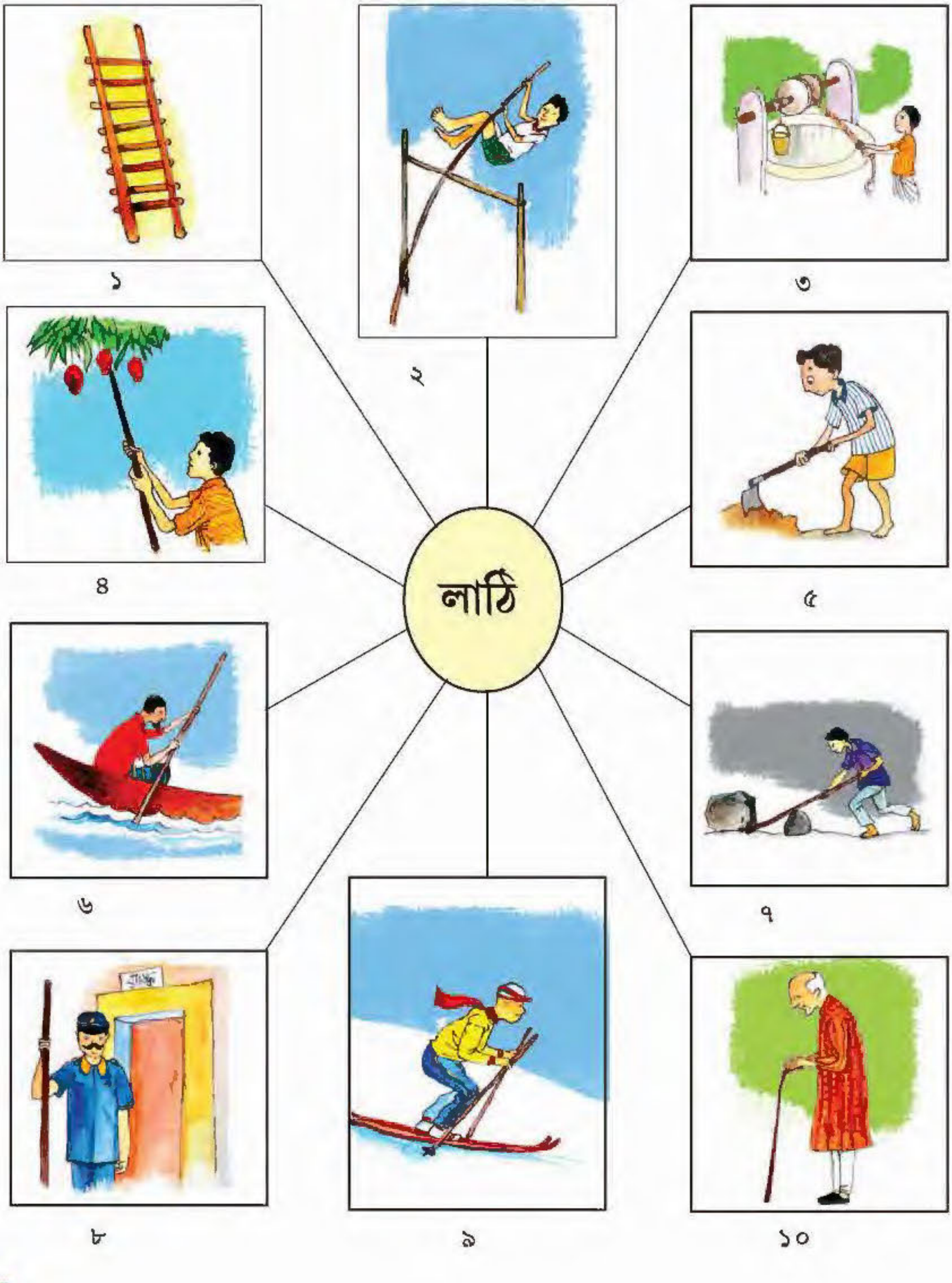

ছবিগুলো দেখে লাঠি কী কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে নীচে লেখো:

ছবি নং	লাঠি কী কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে?
১	
২	
৩	কুয়ো থেকে জল তোলার কাজে (অনেক আগে দড়ির বদলে লাঠি ব্যবহার করা হতো)
৪	
৫	
৬	
৭	সহজে ভারী জিনিস তোলার কাজে
৮	আত্মরক্ষার জন্য লাঠির ব্যবহার: সুরক্ষার জন্য লাঠি ব্যবহার করা হয়
৯	
১০	

ছবিগুলো দেখে রনিতা, দীপ, ঝিলাম আর আলম অনেকগুলো চিনতে পারল। আর বাকিগুলোর কথা দিদিমণির কাছ থেকে জানতে চাইল।

দিদিমণি বললেন — আজ থেকে অনেক বছর আগে মানুষ বনে-জঙ্গলে বাস করত। তখন থেকেই হাতিয়ার হিসাবে গাছের ডাল, লাঠি ব্যবহার করত। তারপর আরো নানারকম কাজেই লাঠির ব্যবহার হয়। ভারী জিনিস তোলার কাজেও লাঠির ব্যবহার তোমরা দেখতে পাবে। ধাতু আবিষ্কারের পর লাঠির মাথায় পাথরের বদলে ধাতুর ফলা জুড়ে বর্শা তৈরি শুরু হয়।

তোমাদের জানা আর কোন কোন কাজে লাঠি ব্যবহার করা হয়, আলোচনা করে লেখো:

কাজের নাম	কীভাবে ওই কাজে লাঠির ব্যবহার হবে

দীপ বলল — দিদি, এসব কাজে লাঠির মতোই আর কিছু ব্যবহার করা যায় না, যেটা লাঠির চেয়ে মজবুত ও টেকসই হবে?

— লাঠির মতোই ব্যবহার করার জন্য এখন তৈরি হয়েছে ধাতুর রড। এভাবেই আরও মজবুত ও টেকসই জিনিসপত্র নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করে নিয়েছে মানুষ।

আগুন থেকে সাবধান

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলেছে। অমিত স্কুলে আসেনি। বাজি ফাটাতে গিয়ে ওর হাত পুড়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন— বাজি, পটকা এসব দাহ্য বস্তু সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত।

সোহম দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করল — দিদি দাহ্য বস্তু কী?

দিদিমণি বললেন— যেগুলিতে আগুন লাগলে সহজেই জ্বলে ওঠে ও অল্প সময়ে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। দহন মানে পোড়া। সেই থেকেই এসেছে দাহ্য কথাটা।

মানসী বলল — খড়, শুকনো পাতা, বিচালি, কেরোসিন, পেট্রোল, বাজি তৈরির মশলা এগুলো তো দাহ্য বস্তু;

বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাদের বাড়িতে যে যে দাহ্য বস্তু আছে তার নাম নীচে লিখে ফেলো।

বর্তমানে আমাদের ঘরে থাকা দাহ্য বস্তু	কেমন সাবধানতা নিলে আগুন লাগা এড়ানো যায়
১.	১.
২.	২.
৩. রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার	৩. ঘরে ঢুকে রান্নার গ্যাসের গন্ধ পেলে কোনো আলো জ্বালাবে বা নেভাবে না। সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে। গ্যাসের নব বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। গ্যাস পরিষেবার লোককে খবর দিতে হবে।
৪. কেরোসিন তেল	৪. জ্বলন্ত স্টোভে কখনই তেল ভরবে না বা পাম্প দেওয়া স্টোভে অতিরিক্ত পাম্প করবে না।
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	৭.
৮. পেট্রোল	৮.

চারপাশের পড়ে থাকা আবর্জনা

দিদিমণি বললেন— পাশের ছবিটা ভালো করে দেখো। আমাদের ফেলে দেওয়া জিনিস সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা হচ্ছে।

করিম বলল— দিদি ছবিটাতে বেশ কিছু নোংরা জিনিস পড়ে রয়েছে। সঙ্গে প্লাস্টিকও আছে।

দিদিমণি বললেন— তোমরা ঠিকই ধরেছ। এই নোংরাগুলোকেই বর্জ্য পদার্থ বলা হয়। বর্জন করা বা ফেলে দেওয়া হয় বলে এগুলোর নাম বর্জ্য। তোমরা দেখবে কিছু বর্জ্য পদার্থ জমিয়ে রাখলে যেমন কাগজ, আনাজের খোসা প্রভৃতি পচে দুর্গন্ধ বেরোয়। আবার কিছু বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মিশে যায় না। যেমন– প্লাস্টিকের বোতল, কাচের টুকরো, প্লাস্টিকের প্যাকেট, টিনের কৌটো।

এবার তুমি উপরের ছবিটি দেখো। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নীচে লেখো। প্রয়োজনে বাড়ির বড়োদের সাহায্য নাও।

বর্জ্য পদার্থের ধরন	কী ধরনের বর্জ্য মাটিতে মেশে / মেশে না	কোথায় দেখেছ	ওই বর্জ্য জমিয়ে রাখলে কী ক্ষতি	কীভাবে এই বর্জ্য পদার্থকে সরিয়ে ফেলা উচিত
১. তরকারির খোসা		১. বাড়ি / মিড-ডে মিলের রান্নাঘরে		১. ডাস্টবিনে ফেলা উচিত
২.				
৩.				
৪				
৫				

সাপের কামড় থেকে সাবধান

মিনু ক্লাসে ঢুকে দিদিমণিকে বলল— কাল আমাদের পাড়ায় একজনকে সাপে কামড়েছে। সবাই বলল খুব বিষাক্ত সাপ। বিষাক্ত মানে কী দিদি?

দিদিমণি বললেন— আসলে সাপের দাঁতের নীচে বিষথলিতে বিষ থাকে। তারা নিজেদের বাঁচাতে মানুষকে কামড়ায়। তখন কামড়ানোর জায়গায় ওই বিষ ঢেলে দেয়। এরকম জিনিস শরীরে প্রবেশ করলেই জ্বালা, যন্ত্রণা শুরু হয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওই স্থান ফুলেও ওঠে। সাপের মতো অনেক প্রাণীর দাঁতের নীচে বা হুলে বিষ থাকে। এরা সবাই বিষাক্ত প্রাণী।

পরের দিন দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটা ছবি দেখালেন। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে কী করতে হবে তার সম্পর্কে কিছু ছবি দেখালেন। তারপর বললেন ছবিগুলো দেখে তার বিষয়বস্তু ডানদিকে লেখো।

দিদিমণি বললেন — বিষাক্ত সাপে কামড়ালে সময়মতো চিকিৎসা না হলে মানুষ মারাও যেতে পারে। এসো দেখি সাপে কামড়ালে আমরা কী করতে পারি।

১. ক্ষতস্থানে বিষদাঁত লেগে থাকলে তা হালকাভাবে তুলে ফেলা। ক্ষতস্থান জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলা দরকার।	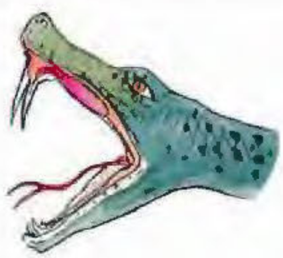
২. হাতের বাহুতে / পায়ের ঊরু অংশে দড়ি হালকা করে বাঁধতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রতি এক দেড় ঘণ্টা পরে বাঁধন খুলে আবার যেন হালকা ভাবে বাঁধা হয়।	
৩. সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।	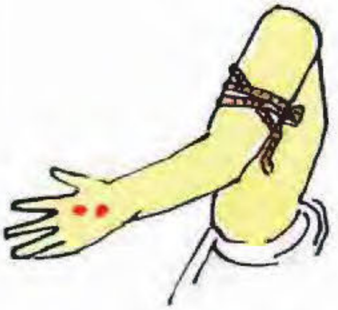
৪. রোগী যাতে ভয় না পায় সেই বিষয়ে সাহস দেওয়া।	
৫. বমি করতে চাইলে বমি করতে দেওয়া।	
৬. শ্বাসকষ্ট হলে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দেওয়া।	

রোগ সারাতে গাছ

তুতাই ক্লাসে এসে দিদিমণিকে বলল— টুকাই আজ স্কুলে আসবে না।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন— কেন?

তুতাই বলল— কাল খেলার সময় ওর পায়ে খুব জোর লেগেছে। সকালে ওর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম ওর পা ফুলে গেছে। ওর মা টুকাইয়ের পায়ে চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিয়েছেন।

চম্পা বলল— আমার গলা ব্যথা হলে মা আমাকে বাসকপাতা, মিছরি, গোলমরিচ জলে ফুটিয়ে গরম জলটা খেতে দেন।

দিদিমণি সব কথা শুনে বললেন— কিছু দিন আগে আমার পায়ে এমন লেগেছিল যে পা ফেলতেই পারছিলাম না। আমার দিদি কোথা থেকে রাংচিতার ডাল নিয়ে এলেন। তারপর ওই ডাল থেঁতো করে আগুনে গরম করলেন। তারপর গরম গরম রস ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। দু-দিন এইভাবে করলাম। তারপর দেখি ব্যথা অনেক কমে গেছে।

নীচের রোগগুলির জন্য প্রাথমিকভাবে কোন কোন ধরনের গাছপালা ব্যবহার করা হয় বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে তা লিখে ফেলো।

কী ধরনের শরীর খারাপ	কোন ধরনের গাছপালা ব্যবহার করা হয়	কীভাবে ব্যবহার করা হয়
১। সর্দি ও কাশি		
২। জ্বর		
৩। আঘাত লেগে ব্যথা		
৪। কেটে গেলে		
৫। পেটের অসুখ সারাতে		

পরেরদিন স্কুলে দিদিমণি জানতে চাইলেন গাছপালা ব্যবহার সম্পর্কে তালিকাতে কী লেখা হয়েছে। তারপর এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো।

খুঁজব গাছ, সারাব রোগ

পরের দিন ক্লাসে দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের বললেন— তোমরা জানলে আমাদের চারপাশের নানা গাছ আমাদের রোগ সারাতে পারে। এসব উদ্ভিদকে ভেষজ উদ্ভিদ বলা হয়।

ডোডো দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করল— দিদি মানুষ কবে বুঝল যে গাছপালাও রোগ সারাতে সাহায্য করে?

দিদিমণি বললেন— সে অনেক আগের কথা। মানুষ তখন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। শাকপাতা ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকত। সেইসময় থেকেই শরীর খারাপ হলে গাছপালা ও তার শিকড়বাকড় খেয়ে রোগ সারাত।

প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা

শেখর দিদিমণিকে বলল— আমার দাদু একদিন বাবার সঙ্গে গাছপালা ও ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

দিদিমণি বললেন— তোমার দাদু ঠিকই বলেছিলেন। এমন কোনো গাছ প্রায় নেই যার কোনো ভেষজ গুণ নেই। তাই গাছপালা চেনাটা আমাদের কাছে খুব জরুরি।

নীচের তালিকাতে কিছু ভেষজ গাছের ছবি দেওয়া হলো। ওই গাছগুলি তোমার এলাকা থেকে জোগাড় করার চেষ্টা করো। ওই গাছগুলির কোন অংশ রোগ প্রতিকারের জন্য কীভাবে ব্যবহার করা হয় বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো।

ভেষজ গাছের ছবি	ওই গাছের কোন অংশ ব্যবহার করা হয়	কোন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয়	কীভাবে ব্যবহার করা হয়
তুলসী			
নয়নতারা			
কালমেঘ			

ভেষজ গাছের ছবি	ওই গাছের কোন অংশ ব্যবহার করা হয়	কোন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয়	কীভাবে ব্যবহার করা হয়
থানকুনি			
কুলেখাড়া			

এলাকার গাছ, ওষুধ বারোমাস

করিম দিদিমণিকে বলল— দিদি, আমাদের এলাকায় একটা বড়ো অর্জুন গাছ আছে। অনেক লোক গাছের ছাল নিয়ে যায়। ওনাদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন ওই গাছের ছাল জলে ভিজিয়ে খেলে নাকি হার্টের অসুখ সেরে যায়।

বিমল কবিরাজ বললেন— অর্জুন গাছ কেন, এরকম অনেক গাছ আছে, যার নানা অংশ নানা রোগ সারাতে ব্যবহার করে থাকেন।

বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করা হয় এমন গাছপালা জোগাড় করো। তার ছবি আঁকো। নীচে লেখো।

গাছপালা	কোন অংশ ব্যবহার করা হয়	কীভাবে ব্যবহার করা হয়	কেন ব্যবহার করা হয়
সিঙ্কোনা	গাছের ছাল থেকে	তেতো ট্যাবলেট	কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে সারাতে
নিম			

গাছপালা	কোন অংশ ব্যবহার করা হয়	কীভাবে ব্যবহার করা হয়	কেন ব্যবহার করা হয়
পেঁপে			
আমলকি			
জাম			
শিউলি			
শুশনিশাক			
কলমিশাক			

হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজে

দিদিমণি কাজের শেষে ছাত্রছাত্রীদের বললেন— আমরা তো অনেক গাছ নিয়েই আলোচনা করলাম। তাছাড়াও তোমার এলাকায় নানাধরনের গাছপালা আছে বা ছিল। যেগুলি অতীতে মানুষ বিভিন্ন রোগ প্রতিকারের জন্য সরাসরি ব্যবহার করত। এমন কিছু গাছের নাম লেখো, যেগুলি আগে তোমার এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায় তা সংখ্যায় হয়তো অনেক কম।

বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করো। না পাওয়ার বা সংখ্যায় কমে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করো।

গাছপালার নাম	তোমার এলাকায় এখনও কি প্রচুর পাওয়া যায়/যায় না	না পাওয়া বা সংখ্যায় কমে যাওয়ার কারণটি উল্লেখ করো
১।		
২।		

গাছপালার নাম	তোমার এলাকায় এখনও কি প্রচুর পাওয়া যায়/যায় না	না পাওয়া বা সংখ্যায় কমে যাওয়ার কারণটি উল্লেখ করো
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		
৭।		
৮।		
৯।		
১০।		

আমরুল পাতার রস
রক্ত আমাশাকে করে বশ ।

পাহাড় অঞ্চলে মানুষের জীবিকা

রোশনদের পরিবার দার্জিলিং-এ থাকে। পাহাড় ছেড়ে সমতলে চলে এসেছে। রোশনের বাবা ওখানে চা-পাতা তৈরির কারখানায় কাজ করেন। রোশন রহমতকে জিজ্ঞাসা করল— তোর বাবা কী করেন?

রহমত বলল— আমার বাবা দিঘা থেকে কম দামে কাজুবাদাম কিনে এনে শহরে বেশি দামে বিক্রি করেন। তাতেই আমাদের সংসার চলে।

দিদিমণি বললেন— নানান অঞ্চলে নানা ধরনের জীবিকা তোমরা দেখতে পাবে। আবার চাষ করা বা মাছ ধরার মতো জীবিকা নানা অঞ্চলে দেখা যায়। কে কোথায় থাকেন তার ওপর জীবিকার ধরন অনেকটাই নির্ভর করে।

রীনা বলল— ঠিক বুঝলাম না দিদি।

— আমাদের রাজ্যে ভূভাগটা সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু পাহাড়, কোথাও মালভূমি। আবার কোথাও শুধু চাষের জমি। এছাড়াও আছে নদী, সমুদ্র, জঙ্গল।

দিদিমণি রোশনকে জিজ্ঞেস করলেন— তুমি দার্জিলিং-এ যখন থাকতে তখন চা-পাতা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কোথায় কোথায় কী কী কাজ করতে মানুষকে দেখেছ?

রোশন বলল— দার্জিলিং বেশ ঠান্ডা জায়গা। টয় ট্রেনে বা জিপে চড়ে কত মানুষ বেড়াতে আসেন। স্থানীয় মানুষ গাড়িতে করে ওদের ঘোরান। হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। খাবার বা শীতের পোশাক ওইসব পর্যটকদের বিক্রি করেন। এছাড়াও অনেকে হাতের তৈরি জিনিসও ম্যালের আশেপাশের রাস্তার ধারে বিক্রি করেন। জঙ্গলের কাঠ থেকে নানা আসবাব ও প্যাকিং বাক্স তৈরির কাজও বহু মানুষ করেন।

— তবে কি পাহাড়ে চাষ হয় না?

— ধান, স্কোয়াশের চাষ হয়। ফুল চাষ হয়। আর হয় কমলালেবু, নাসপাতির মতো ফল।

দিদিমণি বললেন— উঁচু-নীচু ভূমিভাগ হওয়ায় ফসল চাষ ভালোভাবে করা যায় না। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষবাস করতে হয়। এছাড়াও ওখানের স্কুল, কলেজে পড়ানো, অফিসের কাজ আর ব্যাবসা করা অনেকের জীবিকা।

কত জায়গায় কত রকম জীবিকা

নীচের ছবিগুলিতে কে কী কাজ করছেন তা ছবির নীচে লেখো।

অসিত বলল— বাবা বলেন, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বহু মানুষ পাথরের খাদানে কাজ করেন।

জাহাঙ্গির বলল— একবার ট্রেনে যেতে যেতে রানিগঞ্জে কয়লাখনির কথা আমি শুনেছিলাম।

— শুধু রানিগঞ্জ কেন? বর্ধমান জেলার আরও অনেক জায়গায় কয়লা তোলা হয়। এ কাজে বহু মানুষ কাজ করে জীবিকা চালান। আর এই কয়লাকে ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে নানা কলকারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এতেও অনেকে কাজ করেন। পাহাড় ও মালভূমির অংশটুকু বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাকি প্রায় সব অংশই সমভূমি বা নীচু জলা জায়গা। এসব জায়গার মানুষ কৃষিকাজ, মাছধরা, ব্যাবসা করা বা নানা অফিসে চাকরি করেন।

রুমা বলল— জঙ্গলের আশেপাশে যারা থাকেন তাদের তো অফিসে চাকরি বা চাষের কাজ করার সুবিধে নেই। তবে তাদের জীবিকা কী?

মণীশ বলল— জলপাইগুড়িতে জঙ্গলের পাশে আমার মামার বাড়ি। ওখানকার লোকেরা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন। কেউ কেউ কাঠ চেরাইয়ের কলেও কাজ করেন।

— জঙ্গল থেকে শুধু যে কাঠ পাওয়া যায় তা নয়। মধু, পাতা, গাছের ঔষধি অংশ সংগ্রহ করেন জঙ্গল এলাকার মানুষ। এছাড়াও মাছ ধরা, চিংড়ির মীন সংগ্রহ বা নৌকো তৈরিকেও অনেকে নিজেদের জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

এবার তোমরা নীচের তালিকাটি তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বা বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

কোন অঞ্চল	জীবিকার নাম
(১) চাষ জমির আশেপাশে	
(২) খনি এলাকায়	
(৩) ঘন জঙ্গলের পাশে	
(৪) নদী বা সমুদ্রের আশেপাশে	

নানারকম হাতের কাজ ও জীবিকা

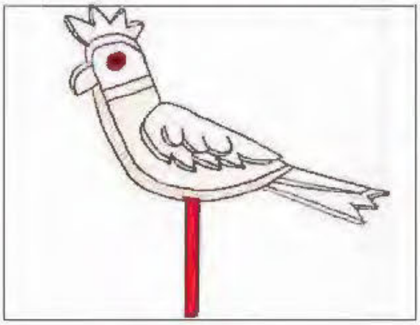

ওপরের ছবিগুলো কীসের ছবি তা ফাঁকা জায়গাগুলোতে লেখো।

পুতুল তৈরি

গল্পের বইতে বিশু তালপাতার সেপাইয়ের কথা পড়েছে। বিশু একদিন স্যারকে জিজ্ঞেস করল তালপাতার সেপাই মানে কী? স্যার যা বললেন তাতে বোঝা গেল— বাচ্চাদের জন্য বানানো তালপাতার একধরনের পুতুল। আগে সব মেলাতেই পাওয়া যেত। পুতুলের পায়ের নীচে কাঠি। কাঠি দু-হাতে ঘোরালেই টুপি পরা সেপাই হাত পা ছুঁড়তে থাকে। খুব মজাদার! কিন্তু এখন আর এসব পুতুল তত পাওয়া যায় না! পটুয়ারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তৈরি করে নানান জিনিসের পুতুল। মনসা ঘট, লক্ষ্মীর পট, রঙিন ছবি আঁকা হাঁড়ি, কলশি এসবও তৈরি করেন কুম্ভকারেরা।

নকশি কাঁথা

কমলিকা অনেকক্ষণ এসব কথা শুনছিল। বলল— আমাদের বাড়িতে পুরানো ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠাকুমার মা-র বানানো নকশি কাঁথা দেখেছি। সামান্য শাড়ি, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাংলার মেয়েরা বানাতেন নকশা করা কাঁথা। কাঁথার গায়ে গল্পকথা, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া এসব সূঁচ-সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মাটির কাজ

রহমতের বাবা কাঁচা মাটি দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। কৃষ্ণনগরের কিছু মানুষ ওই মাটি দিয়ে পুতুল বা প্রতিমা তৈরি করেন। শুধু কাঁচা মাটি নয়, মাটি পুড়িয়েও নানা জিনিস তৈরি হয়। পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি হয় এমন চারটি জিনিসের নাম লেখো।

১। ________ ২। ________ ৩। ________ ৪। ________

দিদিমণি বললেন — ঘর তৈরির পর ঘর সাজাতে বা প্রতিদিনের কাজে টুকিটাকি কত জিনিসের দরকার হয়। তোমরা এরকম কয়েকটা জিনিসের নাম বলতে পারো?

কুসুম বলল — সরা, কুলো, ঝুড়ি।

সোহরাব বলল — হাতপাখা, চাটাই, আসন, পাপোশ — এরকম কত কী!

এবার তোমরা নীচের তালিকার জিনিসগুলো কী কী দিয়ে তৈরি তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

জিনিসের নাম	কী দিয়ে তৈরি	তোমার অঞ্চলে এর কোনগুলো তৈরি হয়
১. নৌকো		
২. মাদুর		
৩. চিরুনি		
৪. হাতপাখা		
৫. ঝাড়ু		
৬. ঘুনি		
৭. দড়ি		
৮. শাড়ি		
৯. গরম জামাকাপড়		

বাঁশের কাজ

মুকুলের বাঁশির আওয়াজ শুনে পাড়ার সবাই ওর বাঁশিটা নেড়েচেড়ে দেখে। জলপাইগুড়ির এক গ্রামীণ মেলা থেকে কিনে এনেছিলেন ওর বাবা। মেলায় নাকি শুধু বাঁশ আর বেতের তৈরি জিনিসের ছড়াছড়ি। ঠাকুমার ফুলের সাজি, কাকার ছিপ আর মার কুলো — সবই ওই মেলা থেকে কেনা। বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে আর কী কী জিনিস তৈরি হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

বাঁশের তৈরি জিনিস	বেতের তৈরি জিনিস

সুবলদের কদম ফুল

শ্বেতা আর কস্তুরী নববর্ষে দোকানে সারি সারি কদম ফুল টাঙানো দেখল। খোঁজ নিয়ে ওরা জানল, এগুলো শোলার তৈরি। বন্ধু সুবলদের বাড়িতে নাকি তৈরি হয়।

সুবলকে জিজ্ঞাসা করায় ও বলল — শোলা দিয়ে বাবা চাঁদমালা আর টোপর তৈরি করেন। দেবদেবীর প্রতিমাও তৈরি হয়।

— শোলার কাজ যারা করেন কোথাও কোথাও তাদের মালাকার বলা হয়।

শোলা দিয়ে তৈরি তোমার চেনাজানা পাঁচটি জিনিসের নাম লিখে ফেলো।

১। ________ ২। ________ ৩। ________ ৪। ________ ৫। ________।

মুখোশ

সহেলি মামার বাড়ি থেকে কালকে ফিরেছে। আজ স্কুলে এসেছে। বলল চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসবে ওরা প্রতি বছর পুরুলিয়ায় মামার বাড়ি যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলাগুলোতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজনের মেলায় ছৌ নাচ হয়।

সহেলি বলল— রামায়ণ-মহাভারতের মতো গল্প দিয়ে তৈরি হয় ছৌ নাচের কাহিনি। ছৌ নাচে মুখোশ পরতেই হয়।

বিশু বলল— এই মুখোশগুলো বানায় কারা?

স্যার বললেন— পুরুলিয়া জেলার জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আছে ছৌ নাচের মুখোশ বানানোর শিল্পীরা। খুব সামান্য জিনিস দিয়ে এগুলো তৈরি হয়। আঠালো মাটি, কাগজের মণ্ড, পাতলা কাপড়, চকচকে করার জন্য গর্জন তেল, আঠা, ধুনো, পাট, নকল চুল, পাখির পালক, রাংতা, পুঁতি, শলমা-চুমকি ও রং ব্যবহার করা হয়।

ঘরে বসে হাতের কাজ

স্যার বললেন— আমাদের রাজ্যে এরকম বহু মানুষ আছেন, যারা ঘরে বসে ছোটো ছোটো শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বিশু বলল— আমি ফুলিয়ায় তাঁতিদের দেখেছি ঘরে বসে তাঁত চালিয়ে শাড়ি তৈরি করতে।

স্যার বললেন— বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর তো বিষ্ণুপুরী সিল্ক শাড়ির জন্য বিখ্যাত। আমার মায়ের আছে। তাতে বালুচরি কাজ করা। আর মুর্শিদাবাদেও সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়।

শেফালি বলল— শাড়ি তো হলো। কিন্তু গয়না! আমাদের রাজ্যে সোনা-রুপোর গয়না বানানো ছাড়াও সুতোর গয়না, পোড়ামাটির গয়না, কাঠের গয়নাও বানায় মানুষ।

— সোনা বা রুপো কী?

— এগুলো হলো ধাতু। এরকম কাঁসা-পিতল বা লোহাও ধাতু।
এসব ধাতু দিয়ে তৈরি তোমার চেনা জিনিসের নাম নীচে লেখো।

জিনিসের নাম	কী ধাতু দিয়ে তৈরি
১. আংটি, বালা, দুল	
২. দা, কোদাল	
৩. থালা, বাটি, গ্লাস	

ডোকরা

স্যার বললেন— পিতল দিয়ে তোমরা বাসনপত্র তৈরির কথা জানলে। আবার বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মতো অনেক জেলায় কিছু লোক মৌ -মোম আর ধুনোর ছাঁচে গলানো পিতল ঢেলে নানান ধরনের মূর্তি তৈরি করেন। আমাদের বাড়িতে আছে এরকম এক পিতলের ময়ূর। পিতলের এসব জিনিসগুলোকে বলা হয় ডোকরা।

বিশু বলল— স্যার, ডোকরার পঞ্চপ্রদীপ, ময়ূর, গণেশ, জগন্নাথ, পেঁচা, কাজললতা, চাল মাপার কৌটো, সপরিবারে মা দুর্গার মূর্তি অনেক মেলায় দেখেছি।

সহেলি বলল— যারা লোহার জিনিস তৈরি করেন তাঁদের তো কর্মকার বলে। ডোকরার কাজ করেন যাঁরা তাঁদের কী বলা হয়?

— এই পিতল-ঢালাই শিল্পীদের কোথাও মালাহার, কোথাও স্যাঁকরা বা কোথাও আবার ঢেপ্পো বলা হয়।

এরকম ধরনের নানা উপাদান দিয়ে জিনিস বানানো ছাড়াও কেউ কেউ অন্য কাজও করেন। মাটির সরা, কলশি বা হাঁড়ির গায়ে ছবি আঁকেন। কেউ বা দেয়াল ও মেঝেতে আল্পনার কাজ করেন। কেউ বা মিষ্টি বানান। আর ছোটো বড়ো নানা কারখানায় কাজ করে কত মানুষের সংসার চলে। কেউ বা মুড়ি ভাজেন আবার কেউ তৈরি করেন সিমেন্ট।

কতরকম উপাদান

এ বছর পাড়ায় নতুন একটা চাউমিন তৈরির কারখানা হয়েছে। ওখানে বেশি ময়দা দিতে পারায় অসিতের বাবার মন বেশ খুশিখুশি। দিদিমণি অসিতের কথা শুনে বললেন— এক একটা জিনিস তৈরির জন্য এক একরকম উপাদান লাগে। আর তা বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করা হয়।

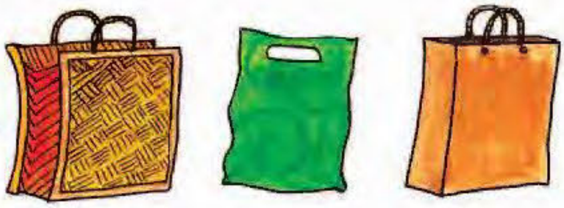

এসো এখন আমরা এরকম তোমার চেনা কিছু শিল্প আর তার প্রধান উপাদান জানার চেষ্টা করি।

শিল্পে কী তৈরি করা হয়	কী উপাদান লাগে বলে তোমার মনে হয়
বিস্কুট, পাঁউরুটি, কেক	
জামাকাপড়	
বাড়ির বারান্দার গ্রিল	
দড়ি, বস্তা, ব্যাগ	

সঞ্জয় বলল— কিন্তু শিল্পের এই উপাদানগুলো কোথা থেকে পাওয়া যায়?

রীনা বলল— কাগজ তৈরির কাঠ আর বাঁশ পাওয়া যায় বন থেকে। আবার ডিম, দুধ, পশম আর রেশম এসব আসে পালিত প্রাণী থেকে।

তোমার এলাকায় যেসমস্ত শিল্প তোমরা দেখো, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অথবা বড়োদের সাহায্য নিয়ে জানার চেষ্টা করো তার উপাদানগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়।

শিল্পের নাম	উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়
১. মিষ্টি বানানো	
২. খেলনা তৈরি	
৩. ঘর সাজানো	
৪. বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি	
৫. কাপড় বোনা	

কোনোটা বাড়িতে তৈরি, কোনোটা কারখানায়

এতরকম উপাদান থেকে যে কীভাবে কী করা হয়, সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি অসিত, সঞ্জয়রা।

দিদিমণি বললেন— এই উপাদানগুলো নিয়ে নানা ধাপে বদলানো হয়। এটা ওটা সঙ্গে মেশানো হয়। কখন বা আগুনে গরম করা হয়। ছোটো, বড়ো যন্ত্রপাতিও লাগে। কখন জিনিসটা দক্ষ কারিগররা হাতেই তৈরি করে নেন।

অসিত বলল— দিদি, সবই তো একরকম জিনিস নয়। আর সব জিনিস তো একই কারখানায় নিশ্চয়ই তৈরি হয় না।

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ। কোথাও কারখানা ছোটো। যন্ত্রপাতি আর লোকজনও লাগে কম। এগুলো হলো ছোটো বা ক্ষুদ্র শিল্প। বাড়ির মধ্যেই আরও কম জায়গায় এধরনের জিনিস তৈরি করা হলে, সেটা কুটির শিল্প।

সঞ্জয়ের বাড়িতে বসেই ধূপ বানানো বা চানাচুর তৈরি করতে দেখার অভিজ্ঞতা আছে। আর মলয়দের বাড়িতে জ্যাম, জেলি, আচার তৈরি হয়।

অসিত বলল— তাহলে দিদি, তাঁতে কাপড় বোনা বা জরির কাজ এগুলোও ক্ষুদ্র শিল্প?

দিদিমণি পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র দেখালেন। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় বা স্থানে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে বোঝালেন।

কী ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	পশ্চিমবঙ্গের কোথায় দেখা যায়
তাঁত শিল্প	হুগলির শ্রীরামপুর, ধনেখালি, নদিয়ার নবদ্বীপ, ...।
রেশম শিল্প	মালদার সুজাপুর, কালিয়াচক, মুর্শিদাবাদের ....।
মৃৎ শিল্প	কলকাতার কুমোরটুলি, ..., নদিয়ার কৃষ্ণনগর, ... ।
গালা শিল্প	পুরুলিয়ার ঝালদা, বাঁকুড়ার সোনামুখি, ...।

তমাল এতক্ষণ মন দিয়ে সব কথা শুনছিল। এবার সে বলল— আমার মামার বাড়ি চিত্তরঞ্জনে। সেখানে তো কত বড়ো কারখানায় রেলইঞ্জিন তৈরি হয়।

দিদিমণি বললেন— বড়ো বড়ো কারখানায় অনেক লোক দিনরাত কাজ করে আর বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি দিয়ে কোনো জিনিস অনেক পরিমাণে তৈরি হলে সেগুলো হলো বড়ো শিল্প। জাহাজ তৈরি, মোটর গাড়ি তৈরি এরকমই বড়ো শিল্প। আমরা যে জামাকাপড় পরি অথবা রোজ ব্যবহার করি এমন জিনিসগুলোর অনেকগুলোই এরকম বড়ো কারখানায় তৈরি।

না পড়ে শেখা নানা কাজ

স্কুল আজ ছুটি। তাই সুরজ খেলতে গেছে পাশের পাড়ার বিনোদদের বাড়িতে। সুরজ অবাক হয়ে দেখছিল, কী সুন্দর একটা পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তি রয়েছে বিনোদদের আলমারিতে। বাড়ি ফিরে তার খুব ইচ্ছে হলো মাটির কিছু বানায়। তাই একটা ঘোড়া তৈরি করে রোদ্দুরে শুকোতে দিল। পরের দিন রান্না শেষ করে, সুরজের মা কাঠের উনুনের মধ্যে সাবধানে পুড়তে দিলেন সেটা।

সুরজের মা দুপুরের পর উনুন থেকে পুতুলটা বের করে দিলেন। সুরজ দেখলো সেটা পুড়েছে বটে, কিন্তু ফেটে চৌচির।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে মিনা, কেতকী, রাহুলের সঙ্গে সুরজ কথাটা বলছিল। দিদিমণিও যোগ দিলেন তাদের কথায়।

সুরজ বলল— আচ্ছা দিদি, বিনোদের বাবা যে বুদ্ধ মূর্তিটা কিনেছেন সেটা তো পোড়ামাটির। আমার তৈরি ঘোড়াটা তাহলে পোড়াতে গিয়ে ফেটে গেল কেন?

দিদিমণি একটু হাসলেন। তারপর বললেন— তুমি কি জানো, বিনোদদের বাড়ির মূর্তিটা কেমন মাটি থেকে তৈরি? জানো না, তাইতো। মাটি পোড়ালেই হবে না। প্রথমে মাটি তৈরি করতে হবে, যাতে পোড়ালেও ফেটে না যায়।

কেতকী বলল — আমার দিদিমা মাটির পুতুল তৈরি করে পুড়িয়ে আমাকে খেলতে দেন। কই সেগুলো তো ফেটে যায় না?

— তার মানে তোমার দিদিমা জানেন, কোন মাটি কত তাপে কতক্ষণ ধরে পোড়ানো যায়। তুমি দিদিমার কাছ থেকে সেটা জানার চেষ্টা করো।

সুরজ বলল — আমি তাহলে কী করে জানব?

— তুমি জানবে কেতকীর কাছ থেকে। আবার তোমার কাছ থেকে জানবে অন্যরা।

মিনা বলল— সবাই তাহলে সব জিনিস তৈরি করতে জানে না; শিখলে তবেই পারবে? কিন্তু শিখবে কী করে?

—এই যে এতরকমের হাতের কাজ বা শিল্পকর্ম। এক একটা জায়গা এক একরকম শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত। আর শুধু সেখানকার মানুষরাই জানেন তার পদ্ধতি। কোথাও লেখাজোখা থাকে না। একজন অন্যজনকে হাতে ধরে কাজ শেখান। এই যে পোড়ামাটির কাজ। বাঁকুড়ায় গেলে দেখবে কতরকম পোড়ামাটির জিনিস। কিন্তু ওই জিনিস তৈরি করতে গেলে কী কী মিশিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে, কতটা পোড়াতে হবে এইসব বিষয় জানতে হবে।

সুরজ বলল — না হলে, ঠিকমতো হবে না।

— মাটি তৈরি না হলেও হবে না; আবার বেশি বা কম পুড়লেও চলবে না। যারা এই কাজটা করছেন, তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে যে সবটাই তাঁরা হাতেকলমে শিখেছেন।

রাহুল বলল— আমাদের বাড়িতে যখন খাটের গায়ে নকশা করছিলেন মোহনজেঠু, তখন দেখেছি কতরকম যন্ত্রপাতি তাঁর। আর হাতুড়ি মারার জোরও কখন কম, কখন বেশি।

— রাহুলের মতো তোমরাও লক্ষ করলে দেখবে যারা কাঠ বা পাথর খোদাইয়ের কাজ করেন, তাদের কাজ করার পদ্ধতি অন্যরকম। সোজা বা বাঁকা, তীক্ষ্ণ বা চওড়া — কতরকম যন্ত্র লাগে।

কেতকী বলল— শুনেছি ডোকরার পুতুল, পেতলের বাতিল অংশ বা অন্য ধাতু গলিয়ে অথবা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

— কিন্তু কেতকী, তুমি নিশ্চয়ই এটা লক্ষ করোনি যে দুটো একেবারে একইরকম জিনিস নেই সেখানে।

—ঠিক দেখিনি তো! এরকম কেন হয় দিদি?

— ওই জিনিসগুলো তৈরির সময় প্রথমে জিনিসটার একটা ছাঁচ বানাতে হয়। এক একটা জায়গায় ছাঁচের আদল এক একরকম। আবার হাতে বানানো বলে একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই। বংশানুক্রমে ওখানকার মানুষ শিখেছে কীভাবে এই ছাঁচ তৈরি করতে হয়, কীভাবে ধাতু গলাতে হয়, তারপর সেই ছাঁচে ঢেলে মূর্তি বানাতে হয়। শেষে ছাঁচ ভেঙে ওই মূর্তি বের করা হয়।

— ও, তাহলে একটা ছাঁচ একবারই ব্যবহার করা যায়। সেজন্যেই সব আলাদা দেখতে হয় ডোকরার পুতুলগুলো।

— তারপর সেগুলোকে ঘষামাজা করলে তবেই বিক্রির উপযুক্ত হয়।

যে সমস্ত অলিখিত জ্ঞানের কথা জানলে নীচে লিখে ফেলো

কী কাজ করতে লাগে	কী কী বিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন
১.	
২.	
৩.	

দিদিমণি বললেন— তাহলে দেখো, হাতেকলমে কাজগুলো যদি শেখা না থাকে, তাহলে সেগুলো করাও যাবে না। বই পড়েও করা সম্ভব নয়।

রাহুল বলল— আমরা সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি বেতের টেবিল—চেয়ার, আলোর স্ট্যান্ড — আরও কত কিছু।

— বেতের জিনিস তৈরি করতে গেলে বেতকে বাঁকাতে হয়, বেত জুড়তে হয়, পালিশ করতে হয়। সবরকম বেত বাঁকবেও না; কত মোটা বেত কতটা বাঁকবে সেটা চিনতে হবে। কোনো কাজে বেতের শুধু ছালটা লাগবে, না অন্য

অংশ লাগবে তাও জানতে হবে। কখনো- কখনো কাঁচা বেতকে আগুনে গরম করে বাঁকাতে হয়। কতটা তাপ লাগবে? তা না জানলে বেশি তাপে বেতটা পুড়েই যাবে।

— তার মানে এই কাজটাও শিখতে হবে। যাঁরা কাজটা করেন তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিখতে হবে।

তোমার এলাকায় নীচের কাজগুলোর কোনোটা হয় কী? তার সম্বন্ধে নীচের তথ্যগুলো পূরণ করো :

কী ধরনের কাজ	যিনি করছেন তার পরিবারের অন্য কেউ কাজটা করেন / করতেন কিনা	তিনি কাজটা কার কাছ থেকে শিখেছেন
(১) কাঠের কাজ		
(২) মাটির কাজ		
(৩) নরম পুতুল তৈরির কাজ		
(৪) যে-কোনোরকম গয়না তৈরির কাজ		
(৫) শাড়ির পাড়ের নকশা বোনা		

—আমার মা ভালো আলপনা দিতে পারেন। আমরা লালমাটির দেশের মানুষ। সেখানে বনের কাছাকাছি যেসব মানুষ থাকেন, তাঁদের মাটির বাড়ির দেয়ালে দেখেছি আলপনার মতো বিভিন্ন ছবি আঁকা।

— এসব নকশা তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি। তাই অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। আবার যারা পটচিত্র আঁকেন তাঁরা একরকম রং ব্যবহার করেন। সেই রং কী থেকে পাওয়া যাবে, শুধুমাত্র তাঁরাই জানেন। কোন জিনিস রং করতে কী রং ব্যবহার করা হবে, সেটাও শুধু হাতেকলমে শিখে নেন ভবিষ্যতের শিল্পীরা।

— সেজন্যই ওই পটে আঁকা ছবিগুলো একটু অন্যরকম। তাদের রংগুলোও ঠিক সাধারণ রঙের মতো নয়।

— এখন ভেবে দ্যাখো, যদি কেউ এভাবে কাজগুলো শিখে না রাখেন, তাহলে কী হবে?

— সেই জিনিসটাই আর তৈরি হবে না।

— শিল্পটাই হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

সুরজ বলল— আমাদের বাড়িতে একটা শিং-এর তৈরি বক আছে। যার মধ্যে দিয়ে আলো যেতে পারে। তার মুখে আবার একটা চিংড়ি মাছ আছে। আচ্ছা দিদি, এরকম জিনিস তো এখন আর খুব একটা চোখে পড়ে না?

—তাহলে নিশ্চয়ই খুব কম লোকই এখন এই জিনিস তৈরির কাজটা জানে। তাই বেশি জিনিস তৈরি হয় না, আর তুমি দেখতেও পাও না।

দিনের শেষে গল্পগাথা

ছন্দার বাড়িতে দিদিমা এলে ওর খুব আনন্দ হয়। সন্ধেবেলায় বাবা জ্যেঠুরা কাজের জায়গা থেকে ফিরে আসেন। অনেকে মিলে একসঙ্গে গল্প করতে বসে। ছন্দাও দিদিমার কাছে নানা গল্প শোনার বায়না করে। আর দিদিমাও মনের আনন্দে নানা গল্প শোনায়। সেই গল্পে থাকে অপূর্ব রাজপুত্র, কোটালপুত্র, রাজকন্যা আর দৈত্য-দানব। আবার কোনো কোনো গল্পে থাকে নানা পশু-পাখি। চালাক শেয়ালের গল্প, খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প, বোকা হাতির গল্প, সিংহ ও চালাক ইঁদুরের গল্প ছন্দা দিদিমার কাছে শোনে আর অবাক হয়ে যায়। রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্পে লড়াই থাকে। দৈত্য-দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে খুব কষ্ট করে হলেও জেতে রাজপুত্র-রাজকন্যারা। এগুলো কোথাও লেখা ছিল না। মুখে মুখে মানুষ শুনেছে আর দিদিমাদের মতো করে ছোটোদের বলেছে। তোমাদের মনে আছে রাখাল বালক আর বাঘের

কথা? সেই যে রাখাল বালক মাঠে গোরু চরাত। মাঝে মাঝে মজা করে মিথ্যে মিথ্যে পালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করত। সেই চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে মানুষ ছুটে আসত। রাখাল বালককে বাঁচানোর জন্য। আর তাই দেখে রাখাল খুব হাসত। একদিন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ল। রাখাল বালক খুব চিৎকার করল কিন্তু কেউ এল না। আর এই রকম নানা গল্প বলে দাদু-ঠাকুমারা আমাদের নানা উপদেশ দেন। যা আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। তোমরাই বলো রাখালের গল্পে আমরা কী শিখলাম? এরকম ভাবেই লোকমুখে নানা গল্প আমরা শুনি। যা আমাদের জীবনে কাজে লাগে। এগুলো সবই লোককথা।

নানা ধরনের লোকগান

শঙ্কুরা দল বেঁধে গেছিল শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়; বাবা, মা, দিদি সবাই কেনাকাটা খাওয়াদাওয়া করতে করতে একটি জায়গায় গিয়ে শঙ্কু দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে একটি মঞ্চ — অনেক মানুষ বসে আছে গোল করে। আর একেক জন করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাইছে। অনেকে বাজাচ্ছে। শঙ্কুর খুব মনে ধরল ব্যাপারটা।

শঙ্কু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল— এরা কী গান গাইছে বাবা? এরা কারা?

বাবা বললেন— এঁরা বাউল, বাউল গান গান।

শঙ্কু বলল— বাউল গান মানে রবীন্দ্রনাথের গান?

বাবা বললেন— না, এই গান পল্লির গান, গ্রামের মানুষেরা গায়। পল্লির গান হলো সমাজের আদি গান।

বাবার ফোন এসে গেল। শঙ্কুর আর এ বিষয়ে কথা বলা হলো না। কিন্তু মাথার মধ্যে গানটা ঘুরতে লাগল— 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় / তারে ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখির পায়'। গানটা শঙ্কু আগেও দু-একবার রেডিয়োতে শুনেছে। ফিরে এসে একদিন ক্লাসে দিদিমণিকে বলল তার পৌষমেলায় বাউল গান শোনার গল্প।

শঙ্কু দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করল— সেই 'খাঁচার ভিতর' গানটি নিয়ে।

দিদিমণি বললেন— এই গানটি লালন ফকিরের। তিনি ছিলেন বাংলার এক মহান সাধক বাউল। যাঁর কাছে আল্লা-হরি-রাম-রহিমের আসন ছিল সমান। যিনি মানুষে মানুষে মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কথা বলেছেন, লিখেছেন।

রিনি জিজ্ঞেস করল— আর কী কী গান আছে আমাদের?

দিদি বললেন— সে তো অনেক। যদি একদম শুরুর কথা ধরো, যখন মানুষ একসঙ্গে জোট বেঁধে থাকত, শিকার করত, তখনও তো তার গান ছিল। নানা রকম কাজের কষ্টকে কমানোর জন্য তারা একসঙ্গে কাজের মধ্যে বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান গাইত।

হবিবুর বলল— কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ির সামনে কিছু লোক

মাটি খুঁড়ে নলকূপ বসাচ্ছিল আর তালে তালে সুর করে কী যেন সব গাইছিল।

দিদিমণি বললেন— ঠিক তাই।

রিনি বলল— ওর মামার বাড়িতে এখনও ধান ঝাড়া, ধান ভাঙার সময় বাড়ির মেয়েরা গান করেন।

দিদিমণি বললেন— নৌকা চালানো, তারপর ছাদপেটা, মাছধরা এইসব কাজগুলোর সঙ্গেই গান আছে। এগুলোকে বলে সারিগান।

জয় বলল— ওদের গ্রামে প্রত্যেক ভাদ্র মাসে ভাদু পুজো হয় আর তার সঙ্গে সারামাস ধরে গান চলতে থাকে।

বিদ্যাধর বলল— তাদের গ্রামে পৌষমাসে টুসু পরব আর টুসু গানের কথা।

তোমরা বাড়িতে বড়োদের কাছে জিজ্ঞেস কোরো তারা এরকম অনেক গানের হদিস দিতে পারেন তোমাদের।

নানা জেলার নানা নাচ

স্কুল থেকে দল বেঁধে সবাই গেল মেলা দেখতে। মেলার মাঠে একটি খোলা জায়গায় গোল করে ভিড় জমেছে। আর শোনা যাচ্ছে বাজনার জোর আওয়াজ। এগোতেই দেখা গেল সেখানে মুখোশ পরে একদল নাচছে। লম্ফ-ঝম্ফ করে সবাই নাচছে।

দিদিমণি— জানো এটা কী নাচ? একে বলা হয় ছৌ-নাচ।

পরদিন ক্লাসে বসে সেই নাচ নিয়েই শুরু হলো কথা।

দিদিমণি— বাংলার আর কোনো নাচের কথা জানো তোমরা কেউ?

শঙ্কু— আমি তো পৌষমেলায় দেখেছিলাম বাউলরা গান গাইতে গাইতে নাচছে।

দিদিমণি— ঠিক। যদিও সব বাউলের নাচ একরকম নয় তবু বাউল গানের সঙ্গে নাচেরও কিছু নির্দিষ্ট মুদ্রা, ভঙ্গি ও পা চালানোর রীতি আছে। যদিও আজকাল সেগুলো অনেকেই করে না।

মাধবী উত্তরবঙ্গের চা বাগান ঘুরতে গিয়ে দেখেছিল আদিবাসী শ্রমিকদের নাচ।

তা শুনে দিদি বললেন— উত্তরবঙ্গে মেচ-রাভাদের অসাধারণ সব নাচ আছে।

বিদ্যাধরের আদি বাড়ি পুরুলিয়ায়। সেখানে বছরে দু বার করে যায় এখনও।

বিদ্যাধর— ঝুমুর নাচের কথা। আদিবাসী মেয়েরা, সাঁওতাল মেয়েরা হাতে হাত ধরে ঝুমুর গাইতে গাইতে নাচ করে, সেই নাচের রয়েছে এক বিশেষ নমুনা।

দিদিমণি— এ শুধু পুরুলিয়া নয়, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর মানে পুরো রাঢ়বঙ্গ জুড়েই এই নাচের প্রচলন।

মহেশ— আমি মালদায় মামার বাড়িতে 'গম্ভীরা' পালা দেখেছি। ওই পালাতেও লোকে নাচে। আসলে লোকসংগীত বা বিভিন্ন লোকপালায় নাচটা এমনি জুড়ে যায়। গান-বাজনার সঙ্গে। গান-বাজনা-নাচ মিলিয়েই পুরো পরিবেশটা তৈরি হয়।

তোমাদের জানা, পড়া নানা গল্প নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো। তারপর নীচে লিখে ফেলো।

তোমার জানা গল্প	গল্প থেকে কী শেখা যায়

লোকগানের প্রথম লাইন	কী উপলক্ষে গাওয়া	গানটি কোথায় শুনেছ

তোমার অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসবে / মেলায় কী কী ধরনের নাচ হয় তা লেখো।

উৎসব/মেলার নাম	নাচের নাম

সেকালের ছবি

পরদিন ক্লাসে সুমি জিজ্ঞাসা করল— দাদু বলছিলেন আগে মানুষ দেয়ালেই ছবি আঁকত। আচ্ছা দিদি মানুষ কবে থেকে ছবি আঁকতে শিখল?

দিদিমণি বললেন— বহুবছর আগে আদিম মানুষেরা পাহাড়ের গুহার দেয়ালে, ছাদে নানা ছবি আঁকত। কাঠকয়লার কালি, জন্তুজানোয়ারদের চর্বি মেশানো মাটি দিয়ে ছবি আঁকত।

জামান জিজ্ঞাসা করল— দিদি সেসময় মানুষ কীসের ছবি আঁকত?

দিদিমণি বললেন— তোমাদের মতোই গাছপালা, প্রকৃতি বা মানুষের ছবি আঁকত। সেই সঙ্গে জন্তুজানোয়ারদের ছবি, মানুষের শিকার করার ছবি আঁকত। যাতে তারা পরে ভালোভাবে শিকার করতে পারে। তাই গুহার দেয়ালে বাইসন, বল্গা হরিণ, ভালুক এরকম নানা জীবজন্তুর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

রতন বলল— দিদি গুহার ভেতরে তো খুব অন্ধকার। তারা তাহলে কীভাবে ছবি আঁকত ?

— গুহার ভেতরে ওরা কাঠ, খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালাত। পরে জন্তুজানোয়ারদের চর্বি জ্বালিয়ে গুহা আলোকিত করত। তবে আদিম মানুষেরা শুধু গুহায় ছবি আঁকত না। উটপাখির ডিমের খোলাতেও নানা আঁকিবুঁকির কাজ পাওয়া গেছে। তবে তাদের সেই সময়ের ছবি আজও রয়ে গেছে। আদিম যুগের অনেক পরেও, মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি এঁকেছিল। আমাদের দেশের অজন্তা গুহার দেয়ালে অনেক ছবি পাওয়া গেছে। সেইসব ছবিতে সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের নানা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নানা ছবির কথা

সেসময় মানুষ শুধু শিকার ধরার জন্য ছবি আঁকত না। ভালোলাগা থেকেও ছবি আঁকত। মানুষ মাটির পাত্র বানাতে শিখল। পরে সেগুলোকে ঘষে পালিশ করে চকচকে করতে শিখল। তারপর তার গায়ে নানা ধরনের নকশা বা কারুকাজ ফুটিয়ে তুলল। তোমরা একটা মাটির ঘট জোগাড় করো। তার গায়ে তোমাদের মনের মতো করে নকশা বা ছবি আঁকো। আমরা আমাদের নানা উৎসবে রং-বেরঙের আলপনা দিই। মাটির বাড়ির দেয়ালে নানা রঙের আলপনা বা নকশা দিয়ে সাজানো হয়।

তোমরা ছবি আঁকার সময় কী করো তা মনে করে নীচে লেখো।

কী ধরনের ছবি আঁকতে বেশি পছন্দ করো	তোমার পছন্দের রং কী	ছবি আঁকতে কী কী জিনিস ব্যবহার করো

বাড়িতে বা স্কুলে তোমরা কোন কোন উৎসবে আলপনা দিতে দেখো। নীচে পছন্দমতো একটা আলপনা আঁকো।

মানুষের কত রকম সম্পর্ক

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

ওপরের ছবিগুলো দেখো। কোন ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো? নীচে লেখো।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

৫. ______________________________

৬. ______________________________

টিয়ার দাদা ওর পাশে বসেই একটা বই পড়ছিল। টিয়া একবার উঁকি দিল। দেখল দাদার বইতে একটাও ছবি নেই! ছবি ছাড়া বই টিয়ার ভালোই লাগে না। দাদার বইতে লেখা মানুষ সামাজিক প্রাণী। টিয়া ভাবল, সামাজিক প্রাণী আবার কাকে বলে? ঠিক করল, পরদিন দিদিমণির কাছে জানতে চাইবে এর মানেটা।

পরদিন ক্লাসে দিদিমণি ঢোকা মাত্রই টিয়া প্রশ্ন করল — দিদি, সামাজিক প্রাণী মানে কী?

দিদিমণি বললেন — আসলে মানুষ সমাজে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। একা একা কোনো মানুষই থাকতে পারে না। দলবেঁধে সমাজে থাকে বলেই মানুষকে সামাজিক প্রাণী বলে। হাতি, মৌমাছি আর শিম্পাঞ্জিও একরকম সামাজিক প্রাণী।

পলাশ বলল— পিঁপড়ে, উইপোকারাও তো দল বেঁধে থাকে। ওরাও কি সামাজিক প্রাণী?

— হ্যাঁ। কিন্তু মানুষের সমাজ সেসবের থেকে আলাদা।

রমেশ বলল — দিদি, সমাজ মানে কী দলবেঁধে থাকা?

— সমাজ কথার একরকম মানে হতে পারে একসঙ্গে চলা। সকলের প্রয়োজন সকলে মিলে মেটানো। একের দরকারে সকলের সাহায্য করা।

রাবেয়া বলল — পরিবারেও তো তাই হয় দিদি। সবাই সবার পাশে দাঁড়ায়।

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ। সমাজ ও পরিবারের অনেক মিল আছে।

রানি বলল— দিদি ঠাকুমা একবার একটা কথা বলেছিল —আমাদের অনেক আত্মীয়। আত্মীয় মানে কী দিদি?

— একই পরিবারের শাখা-প্রশাখাকে একসঙ্গে আত্মীয় বলে। আমরা সবাই এক একটা পরিবারে থাকি। ধরো, তোমার পরিবারে ঠাকুরদাদারা পাঁচ ভাই চার বোন। সেই চার বোনের আলাদা পরিবার। আবার তোমার ঠাকুমার তিন ভাই। তাঁদেরও আলাদা পরিবার। সেইসব মানুষেরা তোমাদের সঙ্গে একই পরিবারে থাকেন না। কিন্তু তারা সবাই মিলে তোমাদের আত্মীয়।

রহমান বলল— সেভাবে দেখলে তো আমাদের আত্মীয় মানে অনেক মানুষ!

— হ্যাঁ, তাইতো যতদিন গেছে তত লোক বেড়েছে। আর সম্পর্কগুলো তত ছড়িয়ে পড়েছে।

পলাশ বলল— দিদি সমাজ কী?

—অনেক মানুষ একটা জায়গায় একসঙ্গে থাকেন। তারা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করেন। সেই মিলেমিশে থাকার ফলে মনে হয় যেন একটা বড়ো পরিবার। অথচ সেটা পরিবার নয়। আবার সকলে আত্মীয়ও নয়। যেমন, ডাক্তারকাকু রানির বা রহমানের পরিবারের মানুষ নন। অথচ তিনি তোমাদের খেয়াল রাখেন। তোমরা তাঁর বাড়িতে যাও। একইভাবে তোমরা যারা এই ক্লাসে পড়ো, সবাই একই পরিবারের নও। হয়তো আত্মীয়ও নও। তবু কেমন মিলেমিশে থাকো। এইরকম মিলেমিশে একসঙ্গে থাকা থেকেই সমাজ তৈরি হয়। সমাজ যদিও পরিবারের থেকে বড়ো।

অরুণ বলল— দিদি সমাজ কি মানুষই তৈরি করেছে?

— হ্যাঁ। একসময় মানুষ একজোট হয়ে থাকত। তাতে খাবার খুঁজতে সুবিধা হতো। আবার বন্য পশুর সঙ্গে লড়তেও সুবিধা হতো। তখন মানুষ বুঝল একা থাকার থেকে জোট বেঁধে থাকার সুবিধা বেশি। জোট বাঁধা থেকেই একসময়ে

পরিবার আর সমাজ তৈরি হলো। সমাজে নানা লোক নানা কাজ করেন। সেখানে একজন আরেকজনের উপর নির্ভর করে থাকে। ধরো একজন চাষ করেন। তার ফলানো ফসল বাকিরা খান। আবার একজন কাপড় তৈরি করেন। তাঁর তৈরি করা কাপড় সবাই পরেন। একজনই সব কাজ করেন না বা করতে পারেন না।

এবার দিদিমণি জানতে চাইলেন— বাড়িতে তোমাদের সঙ্গে আর কে কে থাকেন?

সবাইয়ের কথা থেকে বোঝা গেল অধিকাংশেরই বাড়িতে বাবা-মা বা ভাই-বোন আছে। কারো কারো বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা আছেন। অনেকের বাড়িতে আবার জেঠু-জেঠিমা, কাকা-কাকিমা, মামা-মামিমাও থাকেন। আবার তাদের ছেলে-মেয়েরাও থাকে।

ওমর বলল- কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়িতে হঠাৎ জলের কল খারাপ হয়ে গেল। সারিয়ে দিয়ে গেল পাশের পাড়ার হরিকাকা। মাধুরীর মা একবার খুব অসুস্থ হয়েছিলেন। ডাক্তারকাকু একটা ওষুধ লিখে দিলেন। পাড়ার কোনো দোকানে পাওয়া গেল না। শ্রাবণীর বাবা শহরে সরকারি অফিসে চাকরি করতে যান। উনি শহর থেকে ওষুধটা এনে দিলেন।

দিদিমণি বললেন— তোমরা বুঝতে পারলে তো আমরা একা একা কেউ বাঁচতে পারব না। অনেক দিন আগেই মানুষ তা বুঝতে পেরেছিল। আর তাই তারা একসঙ্গে থাকত। যা পেত সবাই ভাগ করে খেত।

পলাশ বলল — দিদি, আমরা তো বন্ধুরা ভাগ করেই খাই। বাড়িতেও সবাই ভাগ করেই খাই।

রাবেয়া বলল — আবার অনেকের সঙ্গে বসেও খাই।

রাজু বলল — হ্যাঁ, দিদি। সেদিন আমাদের পাড়ায় সবাই একসঙ্গে খেলাম। সারাদিন খুব মজা করে কাটল। বড়োরা রান্না করল। খেতে দিল। আমরা নুন, জল, লেবু আর পাতা দিলাম।

নানা মানুষ তোমাকে নানা কাজে সাহায্য করেন।

ওমর বলল— জবার ভাই চোখে ভালো করে দেখতে পায় না। ওর কি তাহলে বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন?

দিদিমণি বললেন— আমাদের সমাজে এরকম অনেকেই আছে যারা জন্ম থেকে চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না। আবার রোগে আক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও অনেকের নানা অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বয়স হলেও মানুষ তার নানা অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাদের সকলেরই বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। অবশ্য এদের সব কাজে সাহায্যের দরকার হয় না। এমনকি এরাও পরিবারে ও সমাজে নানা কাজে সাহায্য করে।

নীচের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করো।

সঠিকভাবে বা একদমই কাজ করতে পারে না মানবদেহের এমন অঙ্গের নাম	প্রধান অসুবিধা	যার এই অসুবিধা আছে সে বন্ধুদের থেকে কী কী সহযোগিতা পেতে পারে	যার এই অসুবিধা আছে সে তার বন্ধুদের কী কী সহযোগিতা করতে পারে
চোখ	দেখতে না পাওয়া বা কম দেখা	বল খেলার সময় শব্দ-ওয়ালা বল নিয়ে খেলা, কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা, যাওয়ার রাস্তা উঁচু-নীচু, গর্ত থাকলে তা বলে দেওয়া,.......	গল্প বলতে পারে, পড়া বুঝিয়ে দিতে পারে, গান, নাটক, আবৃত্তি করতে পারে, টিউবওয়েল পাম্প করতে পারে, ...
কান	শুনতে না পাওয়া বা কম শোনা	ক্লাসরুমে সামনের বেঞ্চে বসতে দেওয়া, যতটা সম্ভব জোরে কথা বলে তাকে বুঝতে সাহায্য করা, ...	যাদের দেখতে অসুবিধা হয় তাকে চলাফেরা করতে সাহায্য করতে পারে, বন্ধুদের খেলায় সাহায্য করতে পারে, ...
জিহ্বা			
পা ও হাত			

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশের সমাজকে খুঁটিয়ে দেখো। সেই সমাজে কে কীভাবে তোমাদের সাহায্য করেন তা দেখো। তোমরা অন্যদের কীভাবে সাহায্য করো তাও ভাবো। তারপর লিখে ফেলো:

তোমার প্রয়োজন	কে এই প্রয়োজন মেটান	তোমার বাড়ির প্রয়োজন	কে এই প্রয়োজন মেটান	প্রয়োজন না মিটলে কী কী অসুবিধা হয়
খাবার	চাষি	ঘরবাড়ি	ঘরামি/রাজমিস্ত্রি	

বিভিন্ন ধরনের সমাজ

রাবেয়া বলল — আমরা সবাই তাহলে সামাজিক জীব। কিন্তু, দিদি, সমাজ চালায় কারা?

দিদিমণি বললেন — সমাজ চালায় সেই সমাজের সমস্ত মানুষ মিলে। তবে সবসময় সমাজ একইরকম ছিল না কিন্তু।

পলাশ বলল — সমাজেরও আবার নানারকম ভাগ হয় না কি, দিদি?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। তা হয় বইকি। ধরো, আমি যদি তোমাদের পুরো নাম জানতে চাই। তোমরা নাম ও পদবি বলবে। তোমার পদবি আর তোমার বাবার পদবি একই। তার মানে তোমার নামের পাশে বাবার পদবি জোড়া হয়। সেই পদবিটাই তোমাদের পরিবারের পদবি। কিন্তু, তোমার মায়ের পদবি আগে আলাদা ছিল। তোমাদের পরিবারে এসে তিনি তোমার বাবার পদবি ব্যবহার করেন।

অরুণ বলল — দিদি, পদবির সঙ্গে সমাজের কী সম্পর্ক?

দিদিমণি বললেন — এই যে বললাম, নানারকম সমাজের কথা। তোমরা অনেকে বাবার পদবি নামের পাশে লেখো। আবার অনেকের আছে জায়গার নামে পদবি।

সুমনা বলল— তাহলে সমাজে মেয়েদের ভূমিকা কী?

দিদিমণি বললেন — আমাদের সমাজে ছেলেমেয়ের ভূমিকা সমান। সে অনেকদিন আগেকার কথা। সবাই দলবেঁধে থাকত। মেয়েরাও শিকারে যেত ছেলেদের সঙ্গে। আবার তারা বাচ্চাদের দেখাশোনাও করত।

পলাশ বলল — আমার মাও চাকরি করেন। আবার বাড়ির কাজও করেন। বাবাও মাকে সাহায্য করেন বাড়ির কাজে। তবে আমাদের বাড়িতে ঠাকুমাই এখন সবার বড়ো, সকলে তাঁর কথা মানেন।

দিদিমণি বললেন — আমাদের দেশের মেঘালয় রাজ্যে খাসিয়াদের সমাজে আজও মা পরিবারের প্রধান। সেই সমাজে মায়ের গুরুত্ব বেশি। পরিবারের প্রধান বলতে মা। তার আদেশই শেষ কথা। সম্পত্তির ওপর পুরুষদের কোনো অধিকার নেই। মায়ের বংশ পরিচয়েই সন্তানের বংশপরিচয়। আমাদের সমাজের কথা বলতে গেলে আমরা বলি আদিপুরুষের কথা। আর খাসিয়ারা বলে আদিমাতার কথা।

রানি বলল— আচ্ছা দিদি সমাজ চিনব কী করে?

— অনেকদিন এক জায়গায় একসঙ্গে থাকার ফলে সমাজ তৈরি হয়। তাই সেই সমাজে লোকেরা কতকগুলো বিষয়ে একইরকম হয়। ধরো সংস্কৃতির কথা। আমরা প্রায় সবাই ক্লাসে একইরকম সংস্কৃতি নিয়ে থাকি। ভাষা, খাবার, পোশাক,

নাচ, গান, উৎসব আর শিল্পকলা নিয়েই সংস্কৃতি। আর তা দিয়ে চেনা যায় এক একটা সমাজকে।

এবার ছবিগুলো থেকে কী কী বোঝা যাচ্ছে বলো।

রাবেয়া বলল — দিদি, নানারকম কাজ করছে সবাই।

পলাশ বলল — পুরুষ ও মহিলা দুজনেই একই কাজ করতে পারে।

দিদিমণি বললেন — এর থেকেও একরকম সমাজের কথা জানা যায়। ধরো, একসময় মানুষ শুধু ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজে বেড়াত। তাকে যাযাবর সমাজ বলা হয়।

রানি বলল — তারপর কি পশুপালন করতে শিখল?

— হ্যাঁ। তখন পশুপালক সমাজ হলো। এরপর চাষ করতে শিখল মানুষ। তখন কৃষিসমাজ তৈরি হলো। সমাজের বেশিরভাগ মানুষই তখন কৃষির কাজ করত।

বিশু বলল — তখনও কারখানা হয়নি দিদি?

— না। প্রথমে ঘরোয়া কাজ দিয়েই শিল্পের কাজ শুরু হলো। তারপর একসময় কারখানা হলো। সে বেশিদিন আগের কথা

নয়। তখন ওইসব বড়ো বড়ো কলকারখানায় চাষের বদলে অনেকে কাজ করতে লাগলেন।

শিবু বলল — ওই সমাজকে কি তাহলে শিল্প-সমাজ বলা যাবে?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। কিন্তু শুধু শিল্প-সমাজ হলে চলে না। খেতে-পরতে হবে তো। তাই কৃষি ও শিল্প পাশাপাশি চলতে থাকল। আজকের সমাজেও তাই কেউ চাষ করেন। কেউবা কারখানায় কাজ করেন। এছাড়াও অনেক পেশা আছে। নানারকম পেশার মানুষ নিয়েই আমাদের সমাজ।

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশের সমাজ খুঁটিয়ে দেখো। তারপর নীচে আলোচনা করে লিখে ফেলো:

আমাদের সমাজে কতরকম ভাষায় মানুষ কথা বলেন	আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ কী কী খাবার খান	আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ কী কী ধরনের পোশাক পরেন	আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ কী কী উৎসব পালন করেন	আমাদের সমাজে পুরুষ ও মহিলারা কী কী জীবিকায় যুক্ত

চাষের সেকাল একাল

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে ওপরের ছবিগুলোর কোনটি কী ধরনের ফসল তা নীচে লিখে ফেলো।

দানা শস্য	ডাল শস্য	তন্তু	ফল	পানীয়	সবজি	তেল	ফুল

সোহরাবদের জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে ধানচাষের কাজ হচ্ছে। বেশ কিছু বছর আগেও ওই ক্ষেতে হাল-বলদ দিয়েই চাষ হতো।

সোহরাবের বাবা বললেন— ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করলে অল্প সময়ে অনেক বেশি জমি চাষ করা যায়। আর খাটনিও কম হয়।

পরদিন স্কুলে গিয়ে সোহরাব জিজ্ঞেস করল— চাষের কাজে এসবের ব্যবহার শুরু হলো কবে?

অনুপ বলল— মামার মুখে শুনেছি, মামাদের ওখানে পাহাড়ে কিছু মানুষ প্রথমে জঙ্গল পোড়ায়। তারপরে ওই জমিতে কোদাল, নিড়ানি দিয়ে চাষবাস করে। আজও সেখানে হাল বা বলদের ব্যবহার শুরু হয়নি।

দিদি বললেন— মানুষের চাষ করতে শেখার একদম প্রথম দিকের আবিষ্কার এটা।

রোকেয়া জিজ্ঞেস করল— মানুষ কবে চাষ করতে শিখেছিল দিদি?

— ঠিক সময় জানা যায়নি। তবে মনে করা হয় আজ থেকে প্রায় নয়-দশ হাজার বছর আগে। তখন মানুষেরা ছোটো ছোটো দলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত খাদ্যের জন্য। খাদ্যের অভাব হলেই মানুষ অন্য জায়গায় চলে যেত। সেসময় মানুষ হয়তো লক্ষ করেছিল পশুপাখির ফল খাবার সময় বা তাদের মলত্যাগের সময় বীজ মাটিতে পড়ে। কিছুদিন পর ওই বীজ থেকে গাছের চারা বেরোচ্ছে। এভাবেই হয়তো সেসময়ের মানুষ বীজ মাটিতে ফেলে চাষের কাজ শিখেছিল।

— চাষের কাজে এরপর তো অনেক পরিবর্তন এসেছে।

— প্রথম দিকের মানুষ মাটিতে বীজ ফেলে ফসল পেলেও তার পরিমাণ ছিল কম। আস্তে আস্তে মানুষ ফলন বাড়ানোর জন্য চাষের নানা ধাপ আবিষ্কার করল।

— ধাপগুলি কী কী?

— চাষ শুরু হয় জমি তৈরি দিয়ে। নিড়ানি বা কোদাল দিয়ে জমি কোপানো হয়। জমিতে তারপর শুরু হয় লাঙল দেওয়া। একাজে প্রথমে বলদকে ব্যবহার করলেও পরে কোথাও কোথাও ঘোড়ার ব্যবহার শুরু হলো।

— মাটি তৈরির পর তো বীজ ফেলা হয় মাটিতে।

— বীজ ফেলার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। আর বীজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে মাটিতে জল থাকা দরকার।

— এবছর বৃষ্টি ভালো না হওয়ায় অনেক চাষের জমি শুকিয়ে গেছে। বীজ থেকে চারাগাছ হয়নি।

— সেসময়ের মানুষেরও হয়তো একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এ সমস্যা সমাধান করার জন্য মানুষ আবিষ্কার করেছিল জলসেচ ব্যবস্থা। নদীর জল সারা বছর ধরে রাখা হতো। ওই জলকে চাষের কাজে ব্যবহার করা হতো। আমাদের দেশের চাষিরা বিভিন্ন নদীর জলকে একইভাবে সেচের কাজে লাগাত। এমন কি কুয়ো, নালা থেকে জল তোলার যন্ত্রও ব্যবহার করা হতো।

— জল পেলে গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।

দিদিমণি বললেন — গাছের বাড়ার জন্য জল কম বা বেশি হলে কিন্তু বিপদ। আবার শুধু জল হলেই গাছের চলে না। মাটিও ভালো থাকা দরকার।

— এজন্যই কি সব মাটিতে চাষ হয় না?

দিদিমণি বললেন — একথা ভাবতে ভাবতেই মানুষ একদিন জমিতে সার ব্যবহার করেছিল। পালিত পশুর মল চাষের জমিতে পড়ে থাকলে চাষ ভালো হতো। কিন্তু চাষের জমির পরিমাণ যখন বাড়ল তখন এত অল্প সারে আর চাষ ভালো হতো না।

বড়োদের/শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো :

চাষের ধাপ	কেন করা হয়

অনুপ জিজ্ঞেস করল— তখন কী কী ফসলের চাষ হতো দিদি?

— প্রথমে শুরু হয়েছিল গম, বার্লি আর যবের চাষ। তারপর একে একে মানুষ শিখল ধান, জোয়ার-বাজরা, সোয়াবিন, আলু, স্কোয়াশ, তামাকের চাষ। তবে সব শস্যের চাষ যে একই সময় বা একই জায়গায় শুরু হয়েছিল তা কিন্তু নয়।

কোনোটা আজকের আফ্রিকায় তো অন্যগুলো আমেরিকা বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

তোমাদের অঞ্চলে যে যে শস্যের, সবজির বা ফলের চাষ হয় তার একটা তালিকা তৈরি করো।

শস্য	সবজি	ফল

তোমার এলাকায় এখন বা বহু বছর ধরে মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে চাষের কাজ করছেন। তোমার এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি বা দিদিমণির সঙ্গে আলোচনা করে লিখে ফেলো।

চাষের জমি কী করে তৈরি করা হয়	চাষের কাজে কী কী জিনিস ব্যবহার হয়	বহু বছর ধরে কী কী শস্যের চাষ হয়

— চাষের জমিতে যখন ফসল ফলে তখন আমাদের বাবা-কাকার খুব চিন্তা হয়। কোনোবার ধানগাছে পোকা তো কোনোবার ঢ্যাড়শগাছে পোকা লাগে। ওইসব ফসল জমিতেই নষ্ট হয়ে যায়।

— শুধু ধান বা ঢ্যাঁড়শ নয়, যেকোনো চাষেই পোকা একটা সমস্যা। পোকা মারার জন্য মানুষ নানা বিষ ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রথম দিকে শুকনো গোবর পোড়া ছাই বা নিম জাতীয় গাছের পাতার রস ব্যবহার করত। তারপর এল পোকামারার রাসায়নিক বিষ। এতে চাষের ফলন বাড়লেও মাটি কিন্তু নষ্ট হতে লাগল।

— ফসল পাকার পর সেসময়কার মানুষ কী করত?

— কিছু ফসল নিজের ব্যবহারের জন্য গোলায় জমিয়ে রাখত। আর না রাখতে পারলে জমিতেই পড়ে নষ্ট হতো। অনেক ফসল নানা পোকামাকড় ও প্রাণীতে খেয়ে নিত। কিছু ফসল বাজারে বিক্রি করত।

আলোচনা করে লেখো:

চাষের কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির নাম	কোন কাজে প্রয়োজন হয়
১। নিড়ানি	
২। কোদাল	
৩। লাঙল	
৪। কাস্তে	
৫। ট্রাক্টর	

চাষের কাজে লাগে এমন তিনটি জিনিসের ছবি আঁকো:

মানুষ কীভাবে পশুকে পোষ মানাল

তালিকা পূরণ করার পর সরোজ দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করল— চাষের কাজে তো সেসময়ের মানুষ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা শিখেছিল। কিন্তু চাষের কাজে কোন কোন পশু ব্যবহার করা হতো?

দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে পোষ মানানো জীবজন্তুর নামের তালিকা দিয়ে বললেন— এর কোন কোন প্রাণীকে মানুষ চাষের কাজে বা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করে?

আলোচনা করে লেখো।

বিভিন্ন জীবজন্তুর নাম	চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়/হয় না	অন্য কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়
১. গোরু/বলদ		
২. মুরগি		
৩. কুকুর		
৪. ভেড়া		
৫. মহিষ		
৬. ঘোড়া		
৭. ছাগল		
৮. হাঁস		
৯. উট		
১০. শুয়োর		

সোহরাব জিজ্ঞেস করল— কীভাবে মানুষ এত ধরনের পশুকে পোষ মানাতে পেরেছিল?

দিদিমণি বললেন— মানুষ তখন সব পশুকেই কিন্তু পোষ মানাতে পারেনি। মানুষ বাঘের মতো হিংস্র জন্তুদের শিকার করত। কিন্তু পোষ মানাতে পারেনি। আবার গোরু, উটকে মানুষ পোষ মানিয়েছিল। মানুষ বাঘকে পোষ মানাতে পারল না, অথচ গোরুকে পোষ মানাতে পারল কেন?

অমল বলল— বাঘ তো হিংস্র, আর গোরু তো খুব শান্ত স্বভাবের।

দিদিমণি বললেন— ঠিক ধরেছ। এছাড়াও মানুষ এমন পশুকেই পোষ মানানোর চেষ্টা করেছিল যারা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়। হাতি বড়ো হতে অনেক সময় নেয়। তুলনায় গোরু অনেক কম সময়ে বাড়ে।

অনুপ জিজ্ঞেস করল— বাঘ শুধু মাংস খায়। আবার গোরু নানা ধরনের খাবার খায়। এটাও কী একটা কারণ দিদি?

দিদিমণি বললেন— ঠিক তাই। মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য তৃণভোজী প্রাণীরা। অথচ গোরুরা ঘাসের পাতা, ধানগাছের কাণ্ড, ভুট্টার বীজ খায়। আবার সরষে খোলও খায়। এগুলো সারা বছর ধরে পাওয়া যায়। এছাড়াও এমন কিছু প্রাণী আছে, যারা সহজেই ভয় পেয়ে যায়, বা তাড়াতাড়ি দৌড়ে-লাফিয়ে পালাতে পারে। যেমন হরিণ। এই ধরনের প্রাণীদের পোষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পালিত প্রাণীর ধরন

রোকেয়া জিজ্ঞেস করল— আমাদের পাশের বাড়িতে রহমতচাচা হাঁস পোষেন। প্রতিদিন সকালে হাঁসগুলোকে বাড়ির পাশের পুকুরে ছেড়ে দিতে আসেন। সারাদিন হাঁসগুলো জলে খেলা করে বেড়ায়। বিকেলে কেউ গিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কেউ আনতে না গেলে অনেকসময় তারা নিজেরাই বাড়ি ফিরে আসে। দিদি, এটাও কি পশুপালন?

দিদিমণি বললেন— ঠিকই বুঝেছ। এটা এক ধরনের পশুপালন। মানুষ দেখল, কোনো কোনো পশুকে নিজেদের সঙ্গে রাখলে চাষের সুবিধা হয়, নানা পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ আবার অন্য হিংস্র প্রাণীদেরও দূরে সরিয়ে রাখে। তাই এদের পালন করলে জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়। শুরু হলো পশুপালন। জানা যায় কুকুরকেই মানুষ প্রথম পোশ মানিয়েছিল, তারপর নানা ধরনের প্রাণী মানুষের বশ মেনেছে।

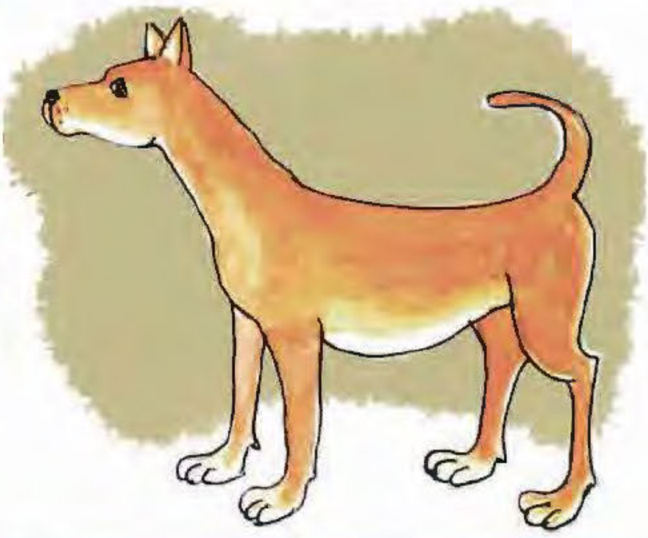

এবার তোমরা আলোচনা করে লিখে ফেলো।

পালিত প্রাণীর নাম	কী ধরনের প্রাণী			
	গবাদি পশু	পাখি	পতঙ্গ	অন্যান্য প্রাণী
১। গোরু				
২। শুয়োর				
৩। ভেড়া				
৪। মুরগি, হাঁস				
৫। কুকুর				
৬। মৌমাছি				
৭। উট				

রকমফেরে রান্নাবান্না আর খাওয়াদাওয়া

নীচের ছবিগুলোতে থাকা খাবারগুলো তোমরা কোনো না কোনো সময় হয়তো খেয়েছ বা দেখেছ। ছবির নীচে খাবারের নামগুলো লেখো—

রানি বলল — দিদি, একটা সমাজে সবাই কি একই খাবার খায়?

দিদিমণি বললেন — সবসময় তা হয় না। আমরা কী খাব তা ঠিক করে আমাদের অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রকৃতি। ধরো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রধান খাবার হলো ভাত। এখানকার মাটিতে অনেকদিন ধরে নানারকম ধানের চাষ হতো। আবার পাঞ্জাবে জোয়ার গম আর বাজরার চাষ বেশি হয়। তাই এক এক অঞ্চলের মানুষের খাদ্যতালিকাতেও এত পার্থক্য। তবে আজকাল মানুষ নানা রাজ্যের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়িগুলোতেও তাই প্রতিদিনই নানারকম রান্না হচ্ছে।

অরুণ ওর ঠাকুরমার কাছে শুনেছে চাল থেকে শুধু যে ভাত হয় তা নয়। বহু আগে থেকেই মানুষ চাল থেকে নানাধরনের খাবার তৈরি করতে শিখেছিল। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন আবার বিশেষ বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি হতো।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কী কী খাবার হয় তা নীচে লেখো।

উৎসবের নাম	ওই উৎসব উপলক্ষে তৈরি বিভিন্ন বিশেষ খাবারের নাম
১। নবান্ন	১।
২। ঈদ	২।
৩। বুদ্ধ পূর্ণিমা	৩।
৪। শারদোৎসব	৪।
৫। বড়োদিন	৫।
৬। টুসু	৬।
৭।	৭।

মৈরাং-এর দাদু ওকে বলেছিলেন— আগে ভাতের সঙ্গে কতরকম শাক-তরকারি রান্না করা হতো। নিম, শিম আর বেগুন দিয়ে শুক্তো। ফুলবড়ি আর আদার রস দিয়ে নটে শাক। বেথুয়া শাকের চচ্চড়ি। উচ্ছে দিয়ে মুগ ডাল। মিষ্টি দিয়ে ছোলার ডালও রান্না হতো বহু বাড়িতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব রান্না হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন রান্নাও শিখছে মানুষ।

দিদি বললেন — রান্না করাও কিন্তু একটা শেখার কাজ। কত পরীক্ষা করে তবে একটা রান্না হয়। সেই পুরোনো দিন থেকেই এক সমাজ অন্য সমাজের থেকে রান্না শিখে আসছে। ধরো, আমরা সবসময় ডাল খেতাম না। আবার পাঁচ- ছশো বছর আগে আলু পড়ত না আমাদের তরকারিতে। এক এক অঞ্চলের মানুষের থেকে এসব খাবার পেয়েছি আমরা।

পলাশ বলল — দিদি, আমাদের থেকে কেউ কিছু খাবার খেতে শেখেনি?

— হ্যাঁ। শিখেছে। রান্নায় নানারকম মশলা ব্যবহার হয়। ভারতের মশলা একসময় গোটা পৃথিবীতে বিক্রি হতো। তারপর ধরো মাছ। নানারকমের মিষ্টি। যেমন - রসগোল্লা, সরভাজা আর সরপুরিয়া এসব আমাদের রাজ্যে এক একটা অঞ্চলে বানানো হয়। এদের স্বাদেরও অনেক পার্থক্য আছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় এদের বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গা নীচের মিষ্টিগুলি তৈরি হওয়ার জন্য বিখ্যাত। শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

মিষ্টির নাম	জায়গার নাম	জেলার নাম
১. সরভাজা / সরপুরিয়া		
২. ল্যাংচা		
৩. নতুনগুড়ের মোয়া		
৪. স্পঞ্জ রসগোল্লা		
৫. মিহিদানা		
৬. প্যাঁড়া		
৭. রসগোল্লা		
৮. মনোহরা		
৯. সীতাভোগ		

রেহানার বাড়ির চারদিকে ছোটো-বড়ো কত পুকুর। ছিপ ফেলে বা জাল দিয়ে ওর আব্বা ও চাচারা প্রতিদিনই মাছ ধরে নিয়ে আসে বাড়িতে। খাল-বিল-নদীনালায় ভরা রেহানাদের এই অঞ্চলে ভাতের সঙ্গে নানাধরনের মাছ খাওয়ার রুচি বহু শত বছর ধরে চলে আসছে। তবে এক এক জেলায় বিশেষ বিশেষ মাছের তৈরি রান্না খেতে মানুষ বেশি পছন্দ করে।

এবার তুমি বাড়ির বড়োদের সঙ্গে এবং শিক্ষিকা/শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

বিভিন্ন রকমের মাছের নাম	ওই মাছ দিয়ে কী কী ধরনের খাবার তুমি খাও	কোন জেলায় মাছের ওই খাবার বেশি প্রচলন দেখা যায়
১। চিতল	১, ... , ২ .... , ৩........	
২। রুই	১, ... , ২ .... , ৩.........	
৩। মৌরলা	১ .... , ২ .... , ৩........	
৪। কই	১......... , ২ .... , ৩........	
৫। বোরোলি	১ .... , ২ .... , ৩........	
৬। ইলিশ	১........, ২ ...., ৩	
৭। পাবদা	১........, ২ ...., ৩	
৮। পমফ্রেট	১........, ২ ...., ৩	

— আমাদের খাদ্যের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নানা ধরনের পানীয়। দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর পানীয়। শরবত, এছাড়াও নুন মেশানো লেবুর জল, দইয়ের ঘোল, আমের শরবত এগুলো আমরা প্রধানত গরমকালে পান করি। আর চা পান করা আমরা চিন দেশ থেকে শিখেছি। খাদ্যের মধ্যে দিয়ে এক সমাজের ছাপ আর এক সমাজে চলে যায়।

ঋষি একবার এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়ে দেখেছিল যে মানুষ যত পরিমাণ খাদ্য নেয় ততটা খায় না। অধিকাংশ খাদ্যই নষ্ট হয়। এ দেখে ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। কত মানুষ প্রতিদিন খাবার পায় না। অপুষ্টিতে ভুগে আমাদের মতো কত শিশু প্রতিদিন মারা যায়। উৎসব উপলক্ষে খাবারের অপচয় না করাই উচিত।

দিদিমণি বললেন — এব্যাপারে সমাজের সব মানুষেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে তোমরা একটি পোস্টার তৈরি করো ।

খাবার যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল

মৈরাং বলল — দিদি, সবসময় কি মানুষ খাবার নষ্ট করত?

দিদিমণি বললেন — না। ঠিক তা নয়। একসময় মানুষ খাবার বাঁচাবার উপায়ই জানত না। ধরো, সকলে মিলে একটা বড়ো পশু শিকার করেছে। সবার খাবার পরেও অনেকটা পড়ে রইল।

রানি বলল — তখন তো আর ফ্রিজ বা হিমঘর ছিল না। তাহলে কী করত ওই বাড়তি খাবার নিয়ে?

— বাড়তি খাবার তখন নষ্ট হতো।

রহমান বলল — অন্যদের দিয়ে দিত না?

— তখন এখনকার মতো দেওয়া-নেওয়া বা বেচাকেনার ধারণাই ছিল না। আর যাতায়াত ব্যবস্থাও আজকের মতো ছিল না। তাই বাড়তি খাবার পচে নষ্ট হতো। অনেক সময় অন্য জন্তুরাও ওই পড়ে থাকা খাবার খেয়ে নিত।

সোহেল বলল — তাহলে কবে মানুষ খাবার দেওয়া-নেওয়া করতে শিখল?

— যখন কৃষিকাজ শুরু হলো তখন অবস্থাটা বদলে গেল। প্রথমে নিজেদের যতটুকু দরকার ততটুকু খাবারই জোগাড় করত মানুষ। পরে আস্তে আস্তে বাড়তি খাবার তৈরি হতে থাকে। পাশাপাশি সমাজে নানারকম খাবারের চাহিদাও তৈরি হয়। কিন্তু সব অঞ্চলে সব খাবার পাওয়াও যেত না।

তোমাদের বাড়ির কাছের হাটেবাজারে যে সমস্ত খাবার জিনিস বিক্রি হয় তাদের নাম নীচে লেখো। বড়োদের সাহায্য নিয়ে জানার চেষ্টা করো কোন কোন জায়গা থেকে সেগুলো হাটেবাজারে আসে ।

কীরকম খাদ্য	খাদ্যের নাম	কোন কোন জায়গা থেকে আসছে
খাদ্যশস্য		
শাকসবজি		
মাছ, মাংস, ডিম		
ফল		

রহমান বলল— ওপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যেসব খাবার আমাদের রোজই লাগে, তার অনেক কিছুই অন্য জায়গা থেকে আসে। এভাবেই কি তাহলে আগের দিনে এক জায়গার সঙ্গে অন্য জায়গার খাবার লেনদেন হতো?

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ। ধরো, চাষি ধান চাষ করে। আবার জেলেরা মাছ ধরে। আবার আমার মতো যারা চাকরি করে তারা চাষও করে না, মাছও ধরে না। অথচ চাষি, জেলে এবং আমি মাছ-ভাত দুই-ই খাই। এটা কীভাবে হয়?

সনৎ বলল — চাষি জেলেকে চাল দেবেন। বদলে জেলে চাষিকে মাছ দেবেন। আর আপনি চাষি ও জেলের কাছ থেকে চাল ও মাছ হাটবাজার থেকে কিনে নেবেন।

করিম বলল — এভাবেই তো সমাজে খাদ্যের দেওয়া-নেওয়া শুরু হয়ে গেল।

মথন বলল — এখানে বিনিময় ছাড়া খাদ্য নিয়ে বেচাকেনাও তো হলো দিদি।

— হ্যাঁ। হলোই তো। একেবারে শুরুর দিকে মানুষ বেচাকেনা করত না। তখন দেওয়া-নেওয়া করত। তারপর একসময় বেচাকেনা শিখল। তখন আর চালের বদলে মাছ না নিলেও চলত। বাড়তি চাল বিক্রি করে টাকা পাওয়া যেত। সেই টাকায় চাষি কিনত কাপড়। আবার জেলেও বাড়তি মাছ বিক্রির টাকায় হয়তো কিনত গম বা শাকসবজি। এভাবেই একসময় খাবারের বাজার তৈরি হলো।

— আমাদের গঞ্জে সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে। গাড়ি করে, ঝুড়িতে বা মাথায় বস্তা চাপিয়ে অনেক লোক নানা জিনিস নিয়ে আসে। সারাদিন বেচাকেনা চলে আমরাও মাঝেমধ্যে বড়োদের সঙ্গে হাটে যাই।

দিদিমণি বললেন — তাহলে দেখো বাড়তি খাবার দেওয়া-নেওয়া থেকে কত কিছু হলো। ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হলো। তার পাশাপাশি এক অঞ্চলের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের যোগাযোগ তৈরি হলো। বাড়তি খাবার নষ্ট হওয়ার পরিমাণও কমতে লাগল।

করিম বলল — যাদের খাবার কেনার পয়সা নেই তারা কী করে খাবার পাবে?

তুলি বলল — মরুভূমি অঞ্চলে জল নেই। চাষবাসও ভালো হয় না। সেখানকার লোক কীভাবে খাবার পায়?

— রেশন দোকান থেকে অল্পদামে চাল, গম দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বিনে পয়সায় খাবার দেওয়া হয়। আর মরুভূমির আশেপাশে কম বৃষ্টিতে কোনো কোনো ফসল ভালো হয়। আবার যেগুলোর চাষ একদমই হয় না সেগুলো বাইরে থেকে আনতে হয়। এতে খাবার জিনিসের দাম অনেক বেড়ে যায়। পাহাড়েও এজন্য খাবারের দাম অনেক বেশি। এভাবেই এক সমাজের বাড়তি খাবার আবার আর এক সমাজের কাজে লাগে।

খাবার জমিয়ে রাখা

ইস্কুলে এসে যেই না বসতে যাবে, টুবাই দেখতে পেল কাণ্ডটা। খুদে খুদে লাল পিঁপড়েরা তাদের থেকে অনেক ভারী এমন সব খাবারের টুকরো বয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে তারা?

টুবাইয়ের পাশে ইমরান, রেবা আর আয়েষাও এসে হাজির হলো। তারা দেখল সব পিঁপড়ে আবার একা নয়; অনেকে মিলে খাবারের একটু বড়ো টুকরোও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর ঢুকে পড়ছে দরজার কোণে একটা গর্তের মধ্যে।

এমন সময় দিদিমণি ক্লাসে ঢুকলেন। সবাই হুড়োহুড়ি করে যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

ভালো করে জায়গাটা লক্ষ করে দিদিমণি বললেন — ওঃ এই ব্যাপার। আস্তে আস্তে গরম বাড়ছে তো। এরপরই বর্ষাকাল। তাই পিঁপড়েরা খাবার জমাতে শুরু করেছে তাদের বাসায়।

রেবা বলল— আমাদের বাড়ির ধানের গোলা থেকে মাঝে মাঝে ইঁদুর বেরোয়। ওরাও ধান নিয়ে গিয়ে জমা করে নিজেদের গর্তে।

আয়েষা বলল— আমাদের আমগাছে যে মৌচাকটা হয়েছে, তাতে মৌমাছিরা সারাদিনই ফুল থেকে মধু এনে জমা করছে।

গোকুল বলল— আমি টিভিতে দেখেছি, বাঘ বড়ো জন্তু শিকার করে যতটা পারল খেল। আর বাকিটার পাশে শুয়ে বসে পাহারা দিচ্ছে।

দিদিমণি বললেন — তাহলে ভাবো আমাদের চেনা প্রাণীদের অনেকেই কেমন বিভিন্নভাবে খাবার জমিয়ে রাখে।

প্রাণীর নাম	কীভাবে খাবার জমিয়ে রাখে
মুরগি	
আরশোলা	

ইমরান বলল— দিদি, গাছও কী এরকম খাবার জমিয়ে রাখতে পারে?

দিদিমণি বললেন — গাছেরাও তাদের বিভিন্ন জায়গায় খাবার জমা করে। মানুষ শুরুর দিকে ছিল যাযাবর। জল বা খাবার জমিয়ে রাখতে পারত না। তারপর একসময় চাষ করা শিখল।

ইমরান বলল— চাষ করার ফলে অনেক ধান, গম বা অন্যান্য শস্য হতো। সেগুলো রাখত কোথায়?

বিনয় বলল — মাংস জমিয়ে রাখা যায় না। পচে যায়।

— কিন্তু ধান, গম বা অন্য শস্য অনেকদিন ভালো থাকে। প্রথমদিকে মাটিতে গর্ত করে বা পাথরের এবড়ো-খেবড়ো পাত্রে রাখত। তারপর ঝুড়ির গায়ে মাটি লেপে বা মাটির রিং তৈরি করে পাত্র বানাতে শিখল। রোদে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত।

ইমরান বলল— কিন্তু জল, দুধ রাখা তো কঠিন। মাটি গলে যেতে পারে।

কোয়েল বলল — এজন্যই কি মানুষ মাথা খাটিয়ে আগুনে মাটি পোড়াতে শিখেছিল?

— বিভিন্ন সময়ে তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে পোড়ামাটি জলে গুলে যায় না। তাই জল ধরে রাখার জন্যে তারা পোড়ামাটির পাত্র বানিয়েছিল।

রেবা জিজ্ঞাসা করল— তামা, লোহার ব্যবহার জানার পর মানুষ ধাতুর পাত্রও তৈরি করেছিল। তাতেও কি খাবার রাখত?

— ঠিক তাই। তবে যতদিন যাচ্ছিল লোকসংখ্যা ততই বাড়ছিল। মানুষ চাষের জমিও বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। ফলে মানুষের হাতে একসময় প্রচুর ফসল এসেছিল। এত ফসল কোথায় রাখা যেতে পারে?

রহমান বলল — আব্বা বলেন আমাদের গ্রামে আগে নাকি প্রতি বছরই বন্যা হতো। জমির ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে যেত। সেই খারাপ দিনের জন্য আব্বার দাদু বাড়িতে ধানের গোলা বানিয়েছিলেন।

বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো তোমাদের বাড়িতে কোন কোন খাদ্য আগেও রাখা হতো। আর লক্ষ করো সেগুলো এখন কীভাবে রাখা হয়।

কোন খাদ্য বা পানীয় জল	এখন কীভাবে রাখা হয়	আগে কীভাবে রাখা হতো

— প্রাচীন ভারতেও খাবার জমিয়ে রাখত মানুষ। খাবার জমিয়ে রাখার নানান ব্যবস্থা তাদের জানা ছিল।

ইমরান বলল— গোলায় নতুন ধান রাখার আগে গোলা থেকে পুরোনো ধান সব বের করা হয়। তারপর ভালো করে পরিষ্কার করে তবে নতুন ধান ভরা হয়।

— এটাও নিশ্চয়ই দেখা হয় যাতে তার মধ্যে হাওয়া-আলো যথেষ্ট যাতায়াত করতে পারে। কেন বলোতো? যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না হয়।

রেবা জিজ্ঞাসা করল— শহরে কোথায় রাখা হয় এসব জিনিস?

ইমরান বলল— শহরে বড়ো বড়ো গুদাম আছে তার জন্য। কিছু কিছু গুদামের ভেতরটা ফ্রিজের মতো ঠান্ডা। আলু রাখার জন্যে বর্ধমান ও হুগলি জেলায় এরকম অনেক হিমঘর আছে। কাকারা ওই হিমঘরে আলু রাখেন।

দিদিমণি বললেন — আলু তাতে অনেকদিন ভালো থাকে। অন্য সবজি রাখার এরকম ব্যবস্থাও আছে। আমাদের অনেকের বাড়িতে বা দোকানের ফ্রিজেও তো অনেক জিনিস রাখা হয় একই কারণে।

তোমাদের বাড়িতে নীচের জিনিসগুলো কীভাবে রাখা হয় জানার চেষ্টা করো। লেখো অথবা টিক '✓' চিহ্ন দিয়ে বোঝাও।

কী জিনিস	কোনটা কয়েকঘণ্টা ভালো থাকে	কোনটা কয়েকদিন ভালো থাকে	কোনটা দীর্ঘদিন ভালো থাকে	বাড়িতে জিনিসগুলো কীভাবে রাখা হয়
চাল				নিমপাতা, কারিপাতা শুকিয়ে মেশানো হয়।
চিনি				
আলু				
মাছ				

একই খাবার নানা রূপে ও স্বাদে

আয়েষা বলল— এবছর অনেক আম হয়েছে তো আমাদের গাছে। তাই ঠাকুমা কাঁচা আম টুকরো করে কেটে তাতে নুন-হলুদ মাখিয়েছে। আর রোজ রোদে দিচ্ছে।

রেবা বলল— অনেকদিন ধরে রোদে দিলে আম শুকিয়ে যাবে।

ইমরান বলল— শুকনো আম অনেকদিন ভালো থাকবে, তাই না?

দিদিমণি বললেন— যে-কোনো জিনিসে জল কম থাকলে তা অনেকদিন ভালো থাকে। এটা অনেক হাজার বছর আগেই মানুষ বুঝেছিল।

ইমরান জিজ্ঞেসা করল— তার মানে প্রাচীনকালেও মানুষ এভাবে শুকনো করত খাবার জিনিস?

দিদিমণি বললেন— তখনকার দিনেও সবজি বা ফল রোদে বা বাতাসে শুকনো করা হতো। রোমানরা এরকম শুকনো করা ফল ভালোবাসত। প্রাচীনকালে মানুষ মাছ-মাংসও শুকনো করে রাখত।

— তখনকার মানুষ তাহলে সূর্যের তাপকে ব্যবহার করা জানত।

— কিন্তু সব জায়গায় বা সব ঋতুতে রোদের তেজ সমান হয় না। পুরোনো দিনের মানুষ তাহলে অন্যভাবেও মাছ-মাংস রাখার কথা ভেবেছিল?

— আগুনে সেঁকে বা গরম ধোঁয়ায় শুকনো করে মাংস রাখা শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। বাড়িতে মাছ-মাংস রান্না করা দেখেছ। কীভাবে করা হয়?

— প্রথমে নুন-হলুদ মাখিয়ে সেগুলো রেখে দেওয়া হয়। এতে বেশ খানিকটা জল বেরিয়ে আসে মাছ-মাংস থেকে।

— ঠিক তাই। এজন্যেই মাছ-মাংস পাতলা করে কেটে নুন মাখিয়ে শুকনো করা হতো। তারপর রাখা হতো মাটির বা অন্য পাত্রে। এখন দেখবে বাজারে নুন মাখানো শুঁটকিমাছ বিক্রি হয়।

— নুন মাখিয়ে রাখলে মাছ-মাংস ভালো থাকে কেন?

— জীবাণু থেকে খাবারকে বাঁচায় নুন। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ বুঝেছিল নুনের মতো মধু, ঘি বা তেলও জীবাণুর হাত থেকে খাবারকে বাঁচায়। তাই আগেকার দিনে মধুতে ডুবিয়ে রাখা হতো ফলমূল।

মা, ঠাকুমা বা দিদিমার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো নীচের জিনিসগুলো কীভাবে অনেকদিন ভালো রাখা যেতে পারে:

কী জিনিস	কীভাবে অনেকদিন ভালো রাখা যায়
নোনা জলের মাছ	
বাঁধাকপি	
চাল	
টম্যাটো	

— আমাদের দেশের লোকেরা জানত না এভাবে খাবার রাখার কথা?

— শুকিয়ে রাখার কথা জানাই ছিল। এছাড়া অনেকরকম ছোটো গুল্ম মেশানো জারক রসও তৈরি হয়েছিল আমাদের দেশে।

— আচার-কাসুন্দি মাঝে মধ্যেই রোদে দেয় ঠাকুমা। তবে নাকি ওগুলো অনেকদিন ভালো থাকে!

— এভাবে জিনিসগুলোর মধ্যে বাতাস থেকে ঢুকে পড়া জল কমে যায়।

—তাছাড়া বাতাসে ভেসে থাকা জীবাণুরা তো আছেই। তাদের তো খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। সেগুলো কি আমাদের চোখের আড়ালেই ঢুকে পড়ে খাবারে?

— শুধু যে ঢুকে পড়ে তা নয় , সেখানে নিজেদের সংখ্যাও বাড়ায়। একসময় খাবারটাকেই নষ্ট করে ফেলে।

— এই জীবাণুর হাত থেকেও তাহলে খাবারকে বাঁচাতে হবে।

— কাঁচা জিনিস থেকে পচে যেতে পারে এমন অংশ বাদ দেওয়া হয় অনেকসময়।

—আমি দেখেছি, বাড়িতে কুমড়োর দানা বা ভিতরের অংশটা প্রথমেই ফেলে দেওয়া হয়। কাঁচা লঙ্কার বোঁটা ফেলে দেওয়া হয়।

— বাজারে বড়ো মাছের মাথা আর কাটা বিক্রি হয়। বড়ো চিংড়িরও মাথা বিক্রি হয়, দেহটা থাকে না। দেহটা কোথায় যায়?

— দেহটা খুব ঠান্ডা অবস্থায় প্যাকেটে বা বাক্সে বন্দি করা হয়। যাতে অনেকদিন একইরকম থাকে।

— আর প্যাকেটের আলুভাজা যে অনেকদিন ভালো থাকে?

রমা বলল — বাতাস ঢুকতে পারবে না এমন প্যাকেট বা বাক্সে খাবার অনেকদিন ভালো থাকে । তাছাড়া ভাজা জিনিসও অনেকদিন ভালো থাকতে পারে। বাড়িতে দেখেছি অনেকসময়ই কাঁচা মাছ রাখা যায় না বলে ভেজে রাখা হয়। যদি কোনো তরল বা জলসুদ্ধ খাবার রাখতে হয়, তখন কী করা হয়?

নরেন বলল — প্যাকেটের ফলের রস আমি খেয়েছি। বোতলেও বিক্রি হয়।

দিদিমণি বললেন — তরলযুক্ত খাবার বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেটে বা টিনে রাখা হয়। বায়ুশূন্য অবস্থায়। যারা অনেকদিনের জন্যে সমুদ্র যাত্রায় যায় বা পাহাড়ে চড়েন , তারাও টিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যান।

— মহাকাশে যাবার সময়েও কি সুনীতা উইলিয়ামস এরকম খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন? খাবারের গুণ কি সবই ঠিক ছিল?

দিদিমণি বললেন— প্যাকেটে, বোতল বা টিনবন্দি খাবারে অনেকরকম পদার্থ মেশানো হয়। যেগুলো বেশ কিছু দিন তাদের খাদ্যগুণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। তোমরা জানো, টিনবন্দি রসগোল্লাও এভাবে এদেশ থেকে বিদেশে পাঠানো হয়।

তোমার জানা প্যাকেট, বোতল বা টিনবন্দি এরকম তিনটি করে খাবারের নাম লেখো।

খাবারের নাম	কী খাবার	কোথায় পাওয়া যায়

মাটি আর নেইকো খাঁটি

রসুলদের গ্রামটা বেশ সুন্দর। সবারই কিছু না কিছু জমি আছে। চাষবাস করে। বছরের খাবার পেয়েই যায়। মাঠ একদম সবুজ। কেনই বা হবে না। পাশেই তো নদী। সারাবছর জলের অভাব হয় না। তাই নানারকম ফসল হতো। একদিন শুনেছিল ওদের পাশের গ্রামে একটা কারখানা হবে। ঠান্ডা পানীয় জল তৈরির কারখানা। রসুল ভেবেছিল, বাঃ বেশ ঠান্ডা জল খাওয়া যাবে, আর অনেকে কাজ পাবে। কিন্তু বছর দুয়েক পর সব কিছু কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল এর ফলে নদীর জল কমে যেতে লাগল। ওদের গ্রামের পুকুরের মাছ মরে ভেসে উঠতে লাগল। ফসলের পরিমাণ কমে গেল। মাটিতে নানা বিষ মিশতে লাগল কারখানার নোংরা জল থেকে। নানা ধরনের অসুখে ভুগতে লাগল গ্রামের মানুষ। সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো :

কী ছিল	এখন কী হয়েছে	কেন এমন হলো
রসুলদের গ্রামের জমিতে নানারকম ফসল হতো।	ফসলের পরিমাণ কমে গেছে	
	জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে।	
	গ্রামের মানুষ নদীকে ব্যবহার করতে পারছে না।	

রসুল বলল— আজকাল নদীর জল নোংরা হয়ে যাচ্ছে কেন?

দিদিমণি বললেন— জল কমে যাওয়া একটা কারণ তো বটেই। নদীর জল নষ্ট হওয়ার আর কী কী কারণ হতে পারে বলে মনে করো?

দিদিমণি আরও বললেন— নদীর জল ছাড়াও নানা কারণে মাটিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মাটি কী কী কারণে নষ্ট হয়ে যায় তা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মাটি খারাপের ফলে যা যা হয়	কী কী কারণে মাটি খারাপ হয়ে যায়
মাটির ফসল তৈরির ক্ষমতা কমে যাওয়া	
মাটির ওপরটা নষ্ট হয়ে যাওয়া	
মাটিতে জল জমে থাকা	

রসুল বলল— তাহলে কি কারখানাটা না হলেই ভালো হতো?

দিদিমণি বললেন— কারখানা হলে আমাদের ভালোই হয়। অনেকে কাজ পায়। কিন্তু যাঁরা কারখানা চালাবেন তাঁদের কাজ হলো চারপাশের মাটি, জল, বাতাস যাতে খারাপ না হয় সেদিকে নজর রাখা।

বাড়ির পাশের মাঠটা

বাবলি, কৌশিকি,অমিতাভদের পাড়ার ছোট্ট মাঠটা বেশ সুন্দর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একদিন শোনে ওখানে নাকি অনেক বাড়ি হবে। তাই ওদের ভীষণ মন খারাপ। স্কুলে যাওয়ার সময় ওরা মাঠে অনেক লোক দেখল। সব কোদাল, হাতুড়ি, করাত নিয়ে নানা কাজ করছে। কেউ মাটি কোপাচ্ছে। কেউ গাছ কাটছে। কেউ আবার পাঁচিল ভাঙছে। চারপাশে ভীষণ ধুলো। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নাকে রুমাল দিয়ে কোনোরকমে ওরা মাঠটাকে পেরিয়ে যায়। কিছুদিন পর দেখল মাঠের পাশে একটা ডাস্টবিন হয়েছে। সবাই নোংরা ফেলছে। এদিকে মাঠে বাড়ি তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। এখন ওদের বাড়ির জানালাগুলো বন্ধ রাখতে হয়। যা ধুলো আর তার সঙ্গে গন্ধ! গা গুলিয়ে ওঠে। একদিন বাবলিরা ঠিক করল ওখানে গাছ বসাবে। কিন্তু বসাবেই বা কোথায়। চারিদিকেই তো জঞ্জাল। একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে ওরা একটা জবা গাছ বসাল। পালা করে জল দিত ওরা। কিন্তু গাছটা বাঁচল না। অমিতাভর বাবা বলেছিলেন— আসলে ওখানকার মাটিটাই খারাপ হয়ে গেছে। কৌশিকি বলল— মাটিটা খারাপ হলো কী করে? অমিতাভর বাবা বললেন— মাটির কণা জলে ধুয়ে বেরিয়ে গেলে মাটি খারাপ হয়। আবার মাটিতে যা মেশার কথা নয় তা যদি মাটিতে মেশে তাতেও মাটি খারাপ হয়।

পরের দিন মাটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে ক্লাসে আলোচনা হচ্ছিল।

দিদিমণি বললেন— আমাদের চারপাশে নানাভাবে মাটি নোংরা হচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাটির গুণ। বেশি ফসল ফলানোর জন্য মাটিতে দেওয়া হয় নানান সার। বেশি বেশি রাসায়নিক সার দিলে তা'ও মাটিকে বিষিয়ে দিতে পারে। মাটিতে ছড়িয়ে পড়া বিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য প্রাণী।

তোমরা দেখো তো তোমাদের চারপাশের মাটি কীভাবে খারাপ হচ্ছে? বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা করে নীচে লেখো:

তোমার চারপাশের মাটি	মাটিতে কী কী মিশে যাচ্ছে
বাড়ির চারপাশের মাটি	
খেলার মাঠের মাটি	
বাজারের চারপাশের মাটি	

জলই আমাদের জীবন দেয়

নীচের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখো। আমাদের জীবনে জলের নানা ব্যবহারের ছবি। ফাঁকা বাক্সগুলোতে জলের ব্যবহারগুলো লেখো।

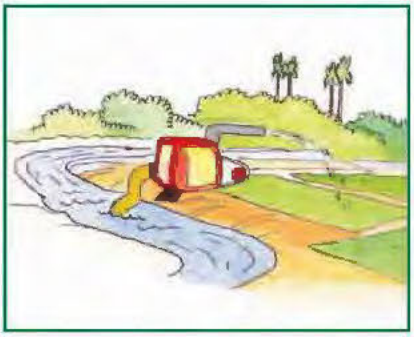

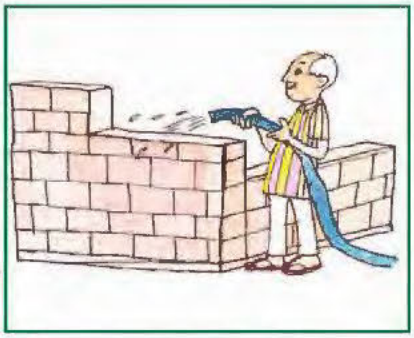

জল ছাড়া বাঁচব কী করে?

সেবার কী কষ্ট। একটুও বৃষ্টি নেই। মাটি একেবারে ফুটিফাটা। চাষের জল নেই। পুকুরও শুকিয়ে গেছে। গোটা গ্রাম জুড়ে জলের হাহাকার। জলের জন্য মানুষ কত হাঁটছে। প্রায় ৬-৭ মাইল হেঁটে গেলে একটা মাত্র কুয়ো। সেখানে কিছুটা জল আছে। সবাই সেখানেই যায় খাবার জলের জন্য। আর কিছুদিন বৃষ্টি না হলে কী যে হবে। না, বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। তিনদিনের মধ্যেই আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

ওপরের গল্পটি পড়ো। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের কাজটি করে ফেলো।

তোমরা কী কী কাজে জল ব্যবহার করো	ওই কাজের জল তোমরা কোথা থেকে পাও
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	

জল নোংরা করি আমরাই

নীচের ছবিটি মন দিয়ে দেখো। আমরা নানাভাবেই জল নোংরা করি, তার ছবি। আর কীভাবে আমরা জল নোংরা করি তা লেখো।

....

....

....

....

....

....

গ্রামের পাশের খালটা

মাধোপুর গ্রামে রূপা-রা কয়েকপুরুষ ধরে থাকে। ওদের বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। আর হবে নাই বা কেন। জ্যাঠা, কাকাদের নিয়ে ওদের বারো ঘর এক উঠোন। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা খাল। কিছু দূর গিয়ে নদীতে মিশেছে। তবে তেমন জল নেই। তিরতির করে জল বয়। আর জল যাবেই বা কী করে। খালের মধ্যে কত প্লাস্টিক বোতল, প্যাকেট সব ভাসছে। জল যাওয়ার রাস্তাই নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরদাদার কাছে রূপা, জিতেন, অনিমারা গল্প শুনছিল। ঠাকুরদাদা বললেন— জানিস আগে এই খালে কত জল থাকত। খালের ওপাশে তো পুরোটাই চাষের জমি । আর জমি চাষে সব জলই নেওয়া হতো এই খাল থেকে। এখন তো খালটা মজে গিয়েছে। রূপা জিজ্ঞেস করল - কী করে দাদু? — এর জন্যে আমরাই দায়ী। জিতেন বলে উঠল— আমরা? দাদু বললেন— হ্যাঁ। আমরা। আমরা বাড়ির যাবতীয় নোংরা খালে ফেলেছি। দিনের পর দিন। অনিমা বলল— তাই খালে এত প্লাস্টিক, এত আবর্জনা। রূপা বলল— আচ্ছা দাদু, খালে তো মাছও বাঁচে না। দাদু বললেন— ঠিক বলেছ দিদি। বাঁচবেই বা কী করে। আমরা জমিতে ভালো ফসল ফলাতে চাই। তাই পোকামারা বিষ দিই। সেই বিষ জলে গুলে যায়। নালা দিয়ে খালে এসে পড়ে। খালের জল বিযাক্ত হয়ে যায়। আর সব মাছ মরে যায়। জিতেন বলল— দাদু ,একটু বৃষ্টি হলেই তো গ্রামে জল জমে যায়। জল তো খাল দিয়ে নামতেই চায় না। খালটা তো মজেই গেছে। রূপা বলল— দাদু আমরা কী কিছু করতে পারি না? দাদু বললেন— চল কালকে আমরা স্কুলে যাব। স্যারদের সঙ্গে একটু আলোচনা করব। আমাদের এই খালটাকে আবর্জনামুক্ত করতেই হবে।

তোমাদের এলাকার খাল/বিল/ ভেড়ি/পুকুর/নদী দেখো। দেখোতো কী কী ধরনের আবর্জনা ফেলা হয়। সেগুলো যাতে না ফেলা হয় তার জন্য তোমরা কী করতে পারো তা লেখো।

কী ধরনের আবর্জনা ফেলা হয়েছে	আগে জল কতটা ছিল, জলের রং কেমন ছিল	এখন জল কতটা আছে, জলের রংই বা কেমন	আগে কত লোক জল ব্যবহার করত	এখন কত লোক জল ব্যবহার করে	ওই জল থেকে কোনো অসুখ হয়েছিল কিনা

বাতাসের ধুলো ধোঁয়া

তিন্নির কদিন থেকে বেশ কাশি। রাতের দিকে দমক বাড়ে। বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে স্কুল। হাঁটাপথেই যাওয়া যায়। তবে রাস্তায় বেশ গাড়ি রয়েছে। গাড়ির কালো ধোঁয়ায় ওর খুব কষ্ট হয়। হাঁটার সময় বেশ কিছু লোকের মুখে সিগারেট থাকে। ধোঁয়া ছাড়ে। ওরা বোঝে না যে এই ধোঁয়া তিন্নিকে কষ্ট দিচ্ছে। ওদের পাড়ার মোড়েই রয়েছে একটা ডাস্টবিন। বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ইঁদুর মরা থেকে বাড়ির যাবতীয় নোংরা পচে গলে পড়ে রয়েছে। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ওদের স্কুলের ঠিক আগে একটা সিমেন্টের গুদাম আর গাড়ি রং করার গ্যারেজ। সিমেন্টের ধুলো আর রঙের ফোঁটায় ওর দম আটকে যায়। রাস্তার পাশে গাছগুলো সব কেটে ফেলেছে। সারি সারি সব দোকান। এ অবস্থা যে শুধু তিন্নির তা কিন্তু নয়, ওদের ক্লাসের তপন, নয়ন, আফসানাদেরও।

আমাদের চারপাশের বাতাস এরকমভাবেই নোংরা হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বাড়ির/স্কুলের চারপাশ কীভাবে খারাপ হচ্ছে তা লক্ষ করো।

কী থেকে খারাপ হচ্ছে	কী ধরনের বিষ বাতাসে আসছে
ইঞ্জিন লাগানো ভ্যানগাড়ি	কালো ধোঁয়া

জল, বায়ু ও মাটির দূষণ

ক্লাসে গ্রামের পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দিদিমণি বললেন— মানুষের জন্যেই বাতাস, জল এবং মাটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ব্যবহারের উপযোগী থাকছে না। এমন হলেই বাতাস, মাটি বা জলের দূষণ হয়েছে বলা হয়।

নীচের ছবিটি ভালো করে দেখো। কোথায় কোথায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা (টিক '✓' চিহ্ন দিয়ে) দেখাও। সেখানে কী দূষণ হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে পাশের ফাঁকা জায়গা পূরণ করো।

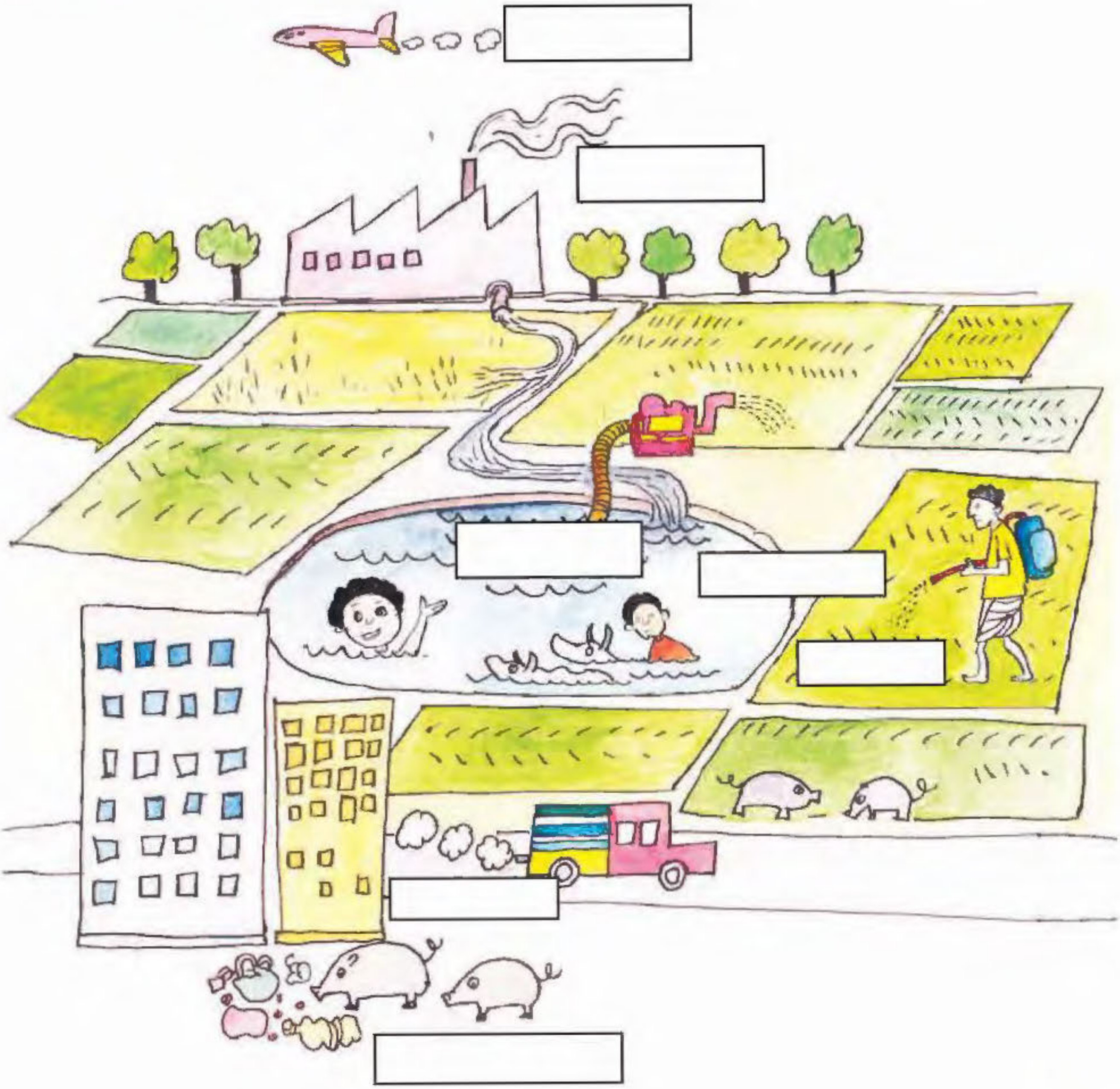

বাড়ির বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। জানো, আগে তোমাদের গ্রাম/শহর/পাড়া কেমন ছিল। তারপর এখন কী অবস্থা। পাশাপাশি মেলাও।

তোমার গ্রাম, শহর বা পাড়ার নাম	আগে কী কী ধরনের নোংরা পাড়ার বা গ্রামের আশেপাশে ফেলা হতো	কোন কোন জায়গায় গাছপালা/জঙ্গল ছিল	চাষের জমিতে কী দেওয়া হতো	আগে কী ধরনের যানবাহন ছিল	কী ধরনের কলকারখানা ছিল

তোমার গ্রাম, শহর বা পাড়ার নাম	এখন কী কী ধরনের নোংরা ফেলা হয়	এখন কোন কোন জায়গায় গাছপালা আছে	চাষের জমিতে কী দেওয়া হয়	এখন কী ধরনের যানবাহন চলে	কী ধরনের কলকারখানা হয়েছে

দূষিত জল বিষম ফল

ওপরের ছবিগুলির প্রকৃতি চিহ্নিত করো এবং এরা কোন কোন ধরনের জলের উৎসে মেশে তার সঙ্গে মেলাও :

বিভিন্ন প্রকারের দূষক	কোন ধরনের জলের উৎসে মেশে
১. গৃহস্থালির নানা বর্জ্য	১. নর্দমার জল
২. প্লাস্টিক	২. পুকুরের জল
৩. কারখানার বর্জ্য	৩. নদীর জল
৪. কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক	৪. সমুদ্রের জল
৫. লঞ্চ/জাহাজের তেল	৫. খালের জল
৬. কচুরিপানা	৬. মাটির নীচের জল

নীচের বক্তব্যগুলি লক্ষ করে কী কী সমস্যা হতে পারে লেখো :

এমন যদি হয়	কী কী সমস্যা হতে পারে
১. নোংরা জলে নিয়মিত স্নান করলে	
২. নোংরা পুকুরের জল পান করলে	
৩. কৃষিক্ষেত্রে সার বা কীটনাশক মাটির নীচের জলের সংস্পর্শে এলে	
৪. নোংরা জলে কাপড় কাচলে	

১. গাছের পাতার ওপর ধূলিকণা জমে যাওয়া

২. নোংরা বর্জ্য খেয়ে কাকের মৃত্যু

৩. পুকুরে মাছ মরে ভেসে ওঠা

৪. সৌধের গায়ে কালো ছোপ

ওপরের ছবিগুলোর বিষয়বস্তু চিহ্নিত করো ও তাদের সঙ্গে যুক্ত দূষণের প্রকৃতি চিহ্নিত করো। কীভাবে দূষণগুলি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা নিজেরা আলোচনা করে বা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে লিখে ফেলো।

ছবির বিষয়বস্তু	দূষণের প্রকৃতি	ক্ষতিকর দূষকের প্রভাবের প্রকৃতি
১.		পাতার ওপর ধূলিকণা জমে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া
২.	মাটিদূষণ	
৩.		
৪.	বায়ুদূষণ	পাথরের রং বদলে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া

তোমার এলাকায় এই ধরনের কী কী দূষণ ঘটতে দেখেছ?

বিশনয়দের গল্প

দিদিমণি সেদিন রাজস্থানের একটা খুব সুন্দর গল্প শোনালেন। তবে এটা ঠিক গল্প না, সত্যি ঘটনা। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে জামভাজি নামে একজন খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শান্তিতে থাকতে আর পরিবেশ ভালো রাখতে ভালো ভালো উপদেশ দিতেন। তাঁর শিষ্যরা ঊনত্রিশটা উপদেশ মেনে চলত বলে তাদের বিশনয় বলা হয়। বিশ মানে কুড়ি আর নয় যোগ করলে ঊনত্রিশ। বিশনয়রা অকারণ গাছপালা কাটে না। কোনো পশুপাখির ক্ষতি করে না। তাদের গ্রামের আনাচে কানাচে হরিণ ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। একবার রাজার লোকেরা তাদের গ্রামের গায়ে লাগা এক জঙ্গলে গাছ কাটতে এলে, বিশনয়ি মেয়েরা গাছদের জড়িয়ে ধরে বলে- তারা গাছ কাটতে দেবে না। সৈন্যরা রেগে গিয়ে হুকুম দিলো বিশনয়িরা গাছ না ছাড়লে অস্ত্র চালাবে। কিন্তু, বিশনয়িরা গাছকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ দিলো।

গল্পটা শুনে সবার চোখে জল এসে গেল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করল— এখন কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করা যায়?

সুমীরা বলল— কেন রাস্তার দু-ধারে, ফাঁকা জমিতে গাছ লাগিয়ে। এভাবে একরকম বনসৃজন হয়।

প্রকাশ বলল— নোংরা জল যাতে পুকুর বা নদীর জলের সঙ্গে না মেশে তার ব্যবস্থা করে।

দিদিমণি বললেন— তোমরা আরও পরিবেশ রক্ষার উপায় ভেবে লেখো।

আমাদের দেশের উত্তরভাগ জুড়ে রয়েছে হিমালয়। আর তারই নীচে রয়েছে অসংখ্য গ্রাম। গ্রামগুলোকে ঘিরে রেখেছে বন। একসময় জ্বালানি আর কলকারখানার জন্য কিছু মানুষ গাছ কাটতে এল। গ্রামের মানুষ গাছকে জড়িয়ে ধরল। সবাই মিলে বাধা দিল। গাছ বাঁচাতে এগিয়ে এলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। গ্রামের মানুষদের বোঝালেন। গোটা হিমালয় জুড়ে হাঁটলেন। তখন ভারত সরকার হিমালয়ের নীচের জঙ্গলের গাছ কাটা নিষিদ্ধ করলেন। গ্রামের মানুষরা এইভাবে নিজেদের পরিবেশ নিজেরাই রক্ষা করল।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরাবারি জঙ্গল। একসময় ওখানে প্রচুর গাছপালা ছিল। গ্রামের মানুষ ওই গাছ কেটে জীবন চালাত। ফলে একদিন সেখানকার পরিবেশ নষ্ট হতে শুরু করল। গাছ কমতে শুরু করল। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এমন সময় এগিয়ে এলেন অজিত কুমার ব্যানার্জি। তিনি গ্রামের মানুষদের বোঝালেন। গ্রামের মানুষ শাল গাছের চারা বসাতে শুরু করল। তারপর সেই গাছ থেকেই তাদের জীবন চালানোর খরচ উঠতে শুরু করল। এভাবেই ফাঁকা হয়ে যাওয়া জায়গায় তৈরি হলো আবার একটি বিশাল বন।

মেঘালয়ের শিলং থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বিখ্যাত মফলং পবিত্র বনভূমি। শান্ত সুনিবিড় জঙ্গল। বড়ো বড়ো কুর্জি গাছের আড়ালে ঢাকা পরে সূর্যের আলো। নানা ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে এখানে। খাসি, জয়ন্তিয়ারা আগলে রেখেছেন এই বন। কোনো রকম ফুল ফল বা পাতা ছেঁড়া কঠোরভাবে বারণ।

নানারকম পুরোনো বাড়ি

নমিতা দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোল। এদিকটায় ও আগে কোনোদিন আসেনি। বেশ বড়ো বড়ো পুরোনো ধাঁচের বাড়ি এদিকটায়। দাদু আজ নমিতাকে রাখালদাদুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ নমিতার চোখে পড়ল একটা ছোট্ট পাঁচিল ঘেরা জায়গা। ভালো করে তাকাতে দেখল একটা মন্দির।

নমিতা বলল— চলো না দাদু, একবার ভেতরে যাই।

মন্দিরটা বেশ পুরোনো! ভেতরে ঢুকতেই মন্দিরটা পুরো চোখে পড়ল। সামনের দিকটা কি সুন্দর কাজ করা।

দাদু বললেন— এটা টেরাকোটার কাজ।

নমিতা জিজ্ঞাসা করল — দাদু টেরাকোটা কী?

দাদু বললেন — নরম মাটি দিয়ে নানান মূর্তি বা নকশা তৈরি করা হয়। তারপর ওই মূর্তি বা নকশাকে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়।

নমিতা জিজ্ঞাসা করল— দাদু, মাটিকে না পোড়ালে কী হতো? দাদু বললেন— পোড়ানো হয়েছিল বলেই মাটির মূর্তি বা নকশাগুলো এতদিন টিকে আছে। বেশি তাপে পোড়ালে মাটি শক্ত হয়। শক্ত পোড়ামাটি জলে সহজে নষ্ট হয় না। এই মন্দিরটা প্রায় পাঁচশো বছর আগের তৈরি। তখন তো এখনকার মতো সিমেন্ট আর বালি দিয়ে বাড়ি হতো না। চুন-সুরকির গাঁথনি ছিল। নমিতা ভাবল, কাল স্কুলে গিয়ে পুরোনো মন্দিরটার কথা সবাইকে বলতেই হবে।

তোমাদের এলাকার পুরোনো মন্দির/মসজিদ/গির্জা/পুরোনো বড়ো বাড়ি দেখো। তারপর দলে মিলে লিখে ফেলো।

পুরোনো মন্দির, মসজিদ, বাড়ি, গির্জা	কী কী দিয়ে তৈরি	কতদিন আগে তৈরি	কারা তৈরি করেছে	সেটি এখন কী অবস্থায় আছে	কেন এই অবস্থা

রাখালদাদুর জাদুঘর

নমিতা দেখল রাখালদাদুর বাড়িটা খুব বড়ো। দেয়ালের কয়েকটা জায়গায় ইট দেখা যাচ্ছে। তবে ইটগুলো বেশ পাতলা। নমিতা বুঝল, এই বাড়িটাও খুব পুরোনো। বাড়ির ভেতরে ঢুকে নমিতা অবাক হয়ে গেল। ঘরগুলো লম্বা। ছাদগুলো অনেক উঁচু। মেঝে থেকে মোটা মোটা থাম উঠে ছাদে ঠেকেছে। জানালা-দরজাগুলো খুব বড়ো বড়ো। জানালার শিকগুলো মোটা মোটা। দরজার পাল্লার কড়াগুলো বেশ বড়ো।

সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল নমিতা। একটা তাকে নানারকমের বই রাখা। তার মধ্যে কয়েকটা বই লাল শালুতে মোড়া।

নমিতা জিজ্ঞাসা করাতে রাখালদাদু বললেন— ওগুলো হলো পুঁথি। তারপর একটা পুঁথি নামিয়ে তিনি নমিতাকে দেখালেন। নমিতা দেখল লাল শালুর ভেতর দুটো আয়তাকার কাঠের পাটা। ওপরের পাটাটা সরাতেই ভেতরে ওই মাপেরই তালপাতা পরপর সাজানো। তার ওপরে সুন্দর করে অনেক কিছু লেখা আছে। আরেকটা তাকে বেশ কয়েকটা হুঁকো রাখা। তার একটা দেখিয়ে দাদু বললেন— এটা আমার ঠাকুরদার আমলের। ঘরের একপাশে রাখা নানারকম মাছ ধরার জিনিসপত্র। বাঁশের তৈরি একটা লম্বা মতো খাঁচা। এছাড়াও ঘরটাতে পুরোনো দিনের নানান বাজনাও আছে। আর আছে মাটির বাসনপত্র, গয়নাগাটি।

দাদু বললেন— এই ঘরটা আমার জাদুঘর। তোমরা ইংরাজিতে যাকে বলো মিউজিয়াম। নমিতা বলল— দাদু, আমরা পারব না এরকম জাদুঘর বানাতে?

দাদু হেসে বললেন—নিশ্চয়ই পারবে। ইস্কুলে তোমরা সবাই মিলে একটা জাদুঘর বানাও। আমরা সবাই একদিন গিয়ে দেখে আসব। ফেরার পথে নমিতা ভাবল, কাল ক্লাসে আরো একটা বিষয় বলতেই হবে। রাখালদাদুর জাদুঘরের কথা।

তোমার বাড়ির/প্রতিবেশীর বাড়ির পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করো। তারপর লিখে ফেলো।

পুরোনো জিনিসের নাম	কী কী দিয়ে তৈরি	কতদিন আগের জিনিস	কী কাজে লাগে

ভারতবর্ষের মন্দির-মসজিদ-গির্জা

পরদিন ক্লাসে এসেই নমিতা আগের দিনের গল্প শুরু করল। পুরোনো মন্দির আর রাখালদাদুর জাদুঘরের কথা শুনে সবাই খুব খুশি। দিদিমণিও বললেন— বাঃ, বেশ খুঁটিয়ে দেখেছ তো। তোমরা কে কে এমন পুরোনো মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা ঘরবাড়ি দেখেছ?

বাবলুর বিষ্ণুপুর দেখা— বাবলু বাবা-মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গিয়েছিল। লালমাটির জায়গা। ওই মাটি পুড়িয়ে তৈরি ইট দিয়েই বানানো হয়েছে নানা মন্দির। মল্লরাজাদের নামেই একসময় বিষ্ণুপুরের নাম ছিল মল্লভূম। মানে মল্লরাজাদের ভূমি বা অঞ্চল। তাঁদের সময়ে এমন অনেক মন্দির বানানো হয়েছিল। রাসমঞ্চ, মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার নানা কাজ সত্যিই সুন্দর। তবে কোথাও কোথাও মন্দিরের গায়ে লোকেরা আঁচড় কেটেছে। সেগুলো দেখে বাবলুর মন খারাপ হয়েছিল।

নাজমার সূর্যমন্দির দেখা— নাজমা পুরী বেড়াতে গিয়ে কোনারকেও গিয়েছিল। সেখানে সূর্যমন্দির দেখে ওর খুব ভালো লেগেছিল। মন্দিরটা একটা বিরাট রথের মতো। চাকাও রয়েছে। ও রথের চাকাগুলো গুনে ফেলেছিল। বারো জোড়া চাকা। দেয়ালগুলোতে নানারকম মূর্তি। কিন্তু মন্দিরটা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের খুব কাছেই এই মন্দির। নোনা জল-হাওয়ার জন্য মন্দিরটা নষ্ট হচ্ছে।

মায়ার জামা মসজিদ দেখা— দিল্লি বেড়াতে গিয়ে মায়া জামা মসজিদ দেখতে গেল। কী বিশাল মসজিদ! বিরাট বিরাট গম্বুজ। সামনে বিরাট বারান্দা। সেখানে কত লোক একসঙ্গে নামাজ পড়ছে। মুঘল সম্রাট শাহজাহান এই মসজিদ বানিয়েছিলেন।

টিপু সুলতান মসজিদ দেখা— একদিন মায়া টিপু সুলতান মসজিদ দেখেছিল। পরে জেনেছিল ওই মসজিদটা কলকাতার বড়ো মসজিদগুলোর একটা। অনেকগুলো গম্বুজ মসজিদটায়। আর আছে মিনার। মসজিদের থেকে আজান শুনতে পেয়েছিল মায়া।

তপনের ব্যান্ডেল চার্চ দেখা— তপন বাবা-মার সঙ্গে ব্যান্ডেল চার্চে বেড়াতে গিয়েছিল। চার্চটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান চার্চ। ১৬৬০ সাল নাগাদ এটা বানানো হয়েছিল। বছরের নানান সময় চার্চটি মানুষ দেখতে যায়। চার্চকে গির্জাও বলে। এখানে যিশুর জীবনের গল্প পুতুলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সৌধ

১

২

দিদিমণি সবার বেড়ানোর কথা শুনলেন। তারপর বললেন— তোমরা যা দেখেছ সেগুলো কোনোটা স্থাপত্য, কোনোটা সৌধ। আর তাদের দেয়ালে নানারকম নকশা বা ভাস্কর্যও দেখেছ।

মায়া জিজ্ঞাসা করল— দিদি স্থাপত্য কোনগুলোকে বলে?

— পুরোনো দিনের বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, গির্জা যা দেখেছ সবই স্থাপত্য। যেমন কোনারকের মন্দির, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ।

৩

মায়া জিজ্ঞাসা করল— দিদি তাহলে সৌধ কী?

— সৌধও একটা স্থাপত্য। তার সঙ্গে কারোর না কারোর স্মৃতি জড়িয়ে থাকে।

মায়া বলল— তাই মমতাজের স্মৃতিতে বানানো বলে তাজমহল সৌধ।

— ঠিক বলেছ।

পলাশ বলল— দিদি ভাস্কর্য কী?

— পাথর বা অন্য কিছুর গায়ে খোদাই করে নকশা, মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়। এটাই ভাস্কর্য।

এই পৃষ্ঠার ছবিগুলির কোনটা স্থাপত্য ও কোনটা ভাস্কর্য? স্থাপত্যের মধ্যে কোনগুলো সৌধ? নীচের খোপে সেগুলোর পাশে টিক (✓) দাও। দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

৮

ছবি নং	স্থাপত্য	ভাস্কর্য	সৌধ
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			

৪

৭

৬

৫

চলো বাঁচাই আমাদের স্থাপত্য

নমিতা বলল — দিদি, এই স্থাপত্য, ভাস্কর্যগুলো কি এখনও আগের মতোই আছে?

দিদিমণি বললেন — পৃথিবীতে অনেক স্থাপত্যই কয়েক হাজার বা কয়েকশো বছরের পুরোনো। ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়বৃষ্টিতে সেগুলির অনেক ক্ষতি হয়েছে। কোনারকের মন্দিরের একটা বড়ো অংশ ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল।

রাজীব বলল — আর কীভাবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য নষ্ট হয়, দিদি?

দিদিমণি বললেন — কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া, ধুলোতেও স্থাপত্য ভাস্কর্যের ক্ষতি করে। তাজমহলের সাদা মার্বেল পাথর সব এখন আর সাদা নেই। তার গায়ে কোথাও কালচে, কোথাও হলদে ছাপ পড়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর ও একই অবস্থা।

তপন বলল — আমাদের গ্রামে একটা তিনশো বছরের পুরোনো মন্দির আছে। দেয়ালে নানা ধরনের টেরাকোটার কাজ ছিল। কিছু লোক অন্যায়ভাবে সেগুলি খুলে নিয়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন — শুধু তাই নয়। অনেক সময় কিছু মানুষ স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের গায়ে আঁচড় কাটে। পানের পিক ফেলে। দেয়ালে নাম লেখে। এইভাবে অনেক সুন্দর জিনিস নোংরা ও নষ্ট হয়ে যায়।

তোমার বাড়ি বা স্কুলের কাছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন পুরোনো স্থাপত্য (বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি) খুঁজে বার করো। আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো।

স্থাপত্য কোথায় অবস্থিত	
কতদিন আগের তৈরি	
স্থাপত্যটির কোন কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেছে	
কী কী কারণে নষ্ট হয়েছে	
স্থাপত্যটি রক্ষা করার জন্য তুমি কী করতে পারো	

কোনো স্থাপত্য বা ভাস্কর্য দেখতে গেলে আমরা কী করব আর কী করব না সে বিষয়ে লিখে ফেলো।

কী করব	কী করব না

নানারকম সংগ্রহশালা

দিদিমণি বললেন— রাখালদাদুর মতো তোমরাও জাদুঘর বানাতে পারো।

দিলীপ বলল — এত পুরোনো জিনিসপত্র পাব কোথায়?

দিদিমণি বললেন — সব সংগ্রহশালা শুধু পুরোনো জিনিস দিয়ে হয় না। এখনকার ব্যবহার করা জিনিস দিয়েও সংগ্রহশালা তৈরি করা যায়।

রহমান বলল — আমাদের এক চাচার বাড়িতে একশোরকম চাল রয়েছে। এই চাল জোগাড় করা তাঁর শখ।

দিদিমণি বললেন — বিজ্ঞানের জিনিসপত্র জোগাড় করে সংগ্রহশালা করা যায়। আবার নামকরা মানুষদের লেখাপত্র, ব্যবহার করা জিনিসপত্র দিয়েও সংগ্রহশালা হয়। তোমরা কি কেউ এমন সংগ্রহশালা দেখেছ?

আদিবাসী মানুষের সংগ্রহশালা

গত বছর ডমরু রাঁচি বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে বিরসা মুন্ডার নামে একটা মিউজিয়াম দেখেছে ডমরু। সেখানে ওই অঞ্চলের পুরোনো মানুষের ব্যবহার করা নানা জিনিসপত্র রাখা আছে। মাছ ধরার নানারকম জাল আর যন্ত্রপাতি। নানা ধরনের ছুরি, কাটারি আর কাস্তে। আদিবাসী মেয়েদের গয়নাগাটি, পোশাক, বাসনপত্র সেখানে রাখা আছে।

বাসের মধ্যে মিউজিয়াম!

রসুল একবার একটা বাস দেখতে গিয়েছিল। তাতে বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি রয়েছে। নানারকম ছবি। একটা সুইচ টিপলেই পৃথিবীটা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আবার একটা আয়না তাতে তাকালে মুখ বদলে যায়। স্যার বলেছিলেন বাসটা আসলে বিজ্ঞানের সংগ্রহশালা। ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের ও সাধারণ মানুষদের বিজ্ঞান শেখায় ও বোঝায়।

জাদুঘরে ওরা

কলকাতায় একটা জাদুঘর আছে। ভারতীয় জাদুঘর। এই জাদুঘরটা দেশের সবচেয়ে পুরোনো। সেখানে রানি তার বাবা মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল। ওরা একটা মমি দেখেছিল। বাবা বলেছিলেন, মিশর দেশের রাজা রানিরা মারা গেলে তাদের মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে রাখা হতো। সেই মৃতদেহগুলিকে মমি বলা হয়। এছাড়া জাদুঘরে ওরা অনেক পুরোনো মূর্তি ও আরো নানা জিনিসপত্র দেখেছিল।

কয়েকটি সংগ্রহশালা:

দিদিমণি বললেন — আজ তোমাদের কয়েকটি সংগ্রহশালার কথা বলি। তোমরা যদি এদের কোনোটায় গিয়ে থাকো, তবে কী কী দেখেছ। কী শিখলে তা খাতায় লেখো।

রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র

জলপাইগুড়ি জেলায় বক্সা অরণ্যের মাঝে এই সংগ্রহশালা। ভুটানের রাজার সঙ্গে কোচবিহারের রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। এই সংগ্রহশালার দেয়ালে সেই যুদ্ধের ছবি আঁকা আছে। নানাধরনের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। নানাধরনের পশু-পাখির মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে রাখা আছে। এই পশু ও পাখিদের দেখলে বক্সা জঙ্গল সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়।

নয়া-পিংলার পটচিত্র সংগ্রহশালা

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা গ্রাম। রংবেরঙের পটচিত্রের জন্য বিখ্যাত। কাপড়ে বা কাগজের ওপর নানা রঙের ছবি আঁকা। ঘরে ঘরে নানা পটচিত্র রাখা আছে। কিছু কিছু পটচিত্র বেশ পুরোনো।

লেপচা মিউজিয়াম

দার্জিলিং জেলার কালিম্পং-এ আছে লেপচা মিউজিয়াম। সেখানে নানাধরনের লেখা পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আর আছে পুরোনো দিনের মানুষের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র।

গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয়, ব্যারাকপুর

উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে রয়েছে এই সংগ্রহশালা। মহাত্মা গান্ধির ব্যবহার করা জিনিসপত্র এখানে রয়েছে। তাছাড়া অনেকরকম বইপত্র, নানা ধরনের মূর্তি ও ছবি রয়েছে এই সংগ্রহশালায়।

দিঘা বিজ্ঞানকেন্দ্র

এই বিজ্ঞানকেন্দ্রে রয়েছে আকাশ দেখার ব্যবস্থা। সামুদ্রিক নানা মাছ জীবন্ত অবস্থায় রাখা আছে কাচের বাক্সে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মডেল রয়েছে এখানে। এগুলো দেখে বেশ সহজ লাগে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো। বেশ মজা করে বোঝা যায়, জানা যায়। এছাড়া বর্ধমান, পুরুলিয়াতেও বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে।

বিড়লা শিল্প-কারিগরি সংগ্রহশালা

কলকাতায় এই সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। এটি পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো বিজ্ঞান মিউজিয়াম। বহু রকমের যন্ত্রপাতির নমুনা রাখা হয়েছে। সেগুলো কীভাবে কাজ করে তাও নানান ছবি ও মডেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে একটি নকল কয়লার খনি রয়েছে। সেটা একেবারে আসল কয়লাখনির আদলে গড়া।

গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম

কলকাতা থেকে খানিক দূরে ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারী গ্রাম। সেখানে ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের নামে একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। বাংলার লোকশিল্পের নানা জিনিসপত্র রাখা আছে এই সংগ্রহশালায়।

চলো বানাই সংগ্রহশালা

ইস্কুলে সংগ্রহশালা বানানোর কথায় সবাই খুব মজা পেল। ঠিক করল সবাই মিলে দলবেঁধে বেরোবে। সঙ্গে থাকবেন দিদিমণি। দিদি বললেন— বেশ তো। চলো, আমরা স্কুলে সংগ্রহশালা বানাব।

আয়ুব বলল — দিদি আমার কাছে অনেক পুরোনো দেশলাই বাক্স আছে। আমার বাবা ছোটোবেলায় জমাতেন।

নয়ন বলল— আমার ঠাকুমার কাছে পুরোনো রুপোর কয়েন আছে।

সোমা বলল— আমার কাছে চাকা লাগানো কাঠের হাতি, পাখি আছে।

দিদি বললেন— বাঃ, এই তো। তোমরা তো সবাই তৈরি দেখছি। চলো সংগ্রহশালা বানানো যাক।

এবার তোমরা সবাই মিলে তোমাদের স্কুলে একটা ঘরে সংগ্রহশালা বানাও। স্কুলের কোনো এক অনুষ্ঠানে তোমাদের সংগ্রহ করা পুরোনো জিনিসপত্র অঞ্চলের মানুষকে দেখাও।

তোমরা নীচের জিনিসগুলো কীভাবে রাখবে তা সাজিয়ে লেখো।

ক) হাতের নানা কাজ— যেমন বাখারি দিয়ে তৈরি ঝুড়ি।

খ) পুরোনো বাসনপত্র

গ) পুরোনো আমলের পোশাক

ঘ) পুরোনো দিনের ছবি— হাতে আঁকা, কিংবা পটে আঁকা ছবি, ফোটোগ্রাফ

ঙ) পুরোনো বইপত্র

চ) বাড়িতে থাকা পুরোনো মূর্তি, পয়সা, টাকা।

ছ) পুরোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।

জ) কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে পাওয়া/নিয়ে আসা জিনিসপত্র

ঝ) ডাকটিকিট, চিঠিপত্র,পুরোনো ডায়ারি, খবরের কাগজ, দেশলাই বাক্স, মার্বেল ইত্যাদি।

তোমাদের সংগ্রহ করা জিনিসগুলো কোন সময়ের তা জানার চেষ্টা করো। তারপর সাদা কাগজে তা লিখে লেবেল লাগাও। সেইসময় মানুষ এগুলোকে কীভাবে কাজে লাগাত তা জানো। এগুলো কী দিয়ে তৈরি তা লেখো। কোন জায়গায়, কীভাবে খুঁজে পেয়েছ তাও লেখো।

জিনিসের নাম	কী কাজে লাগত	কী দিয়ে তৈরি	কোন জায়গায় পাওয়া গেছে

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

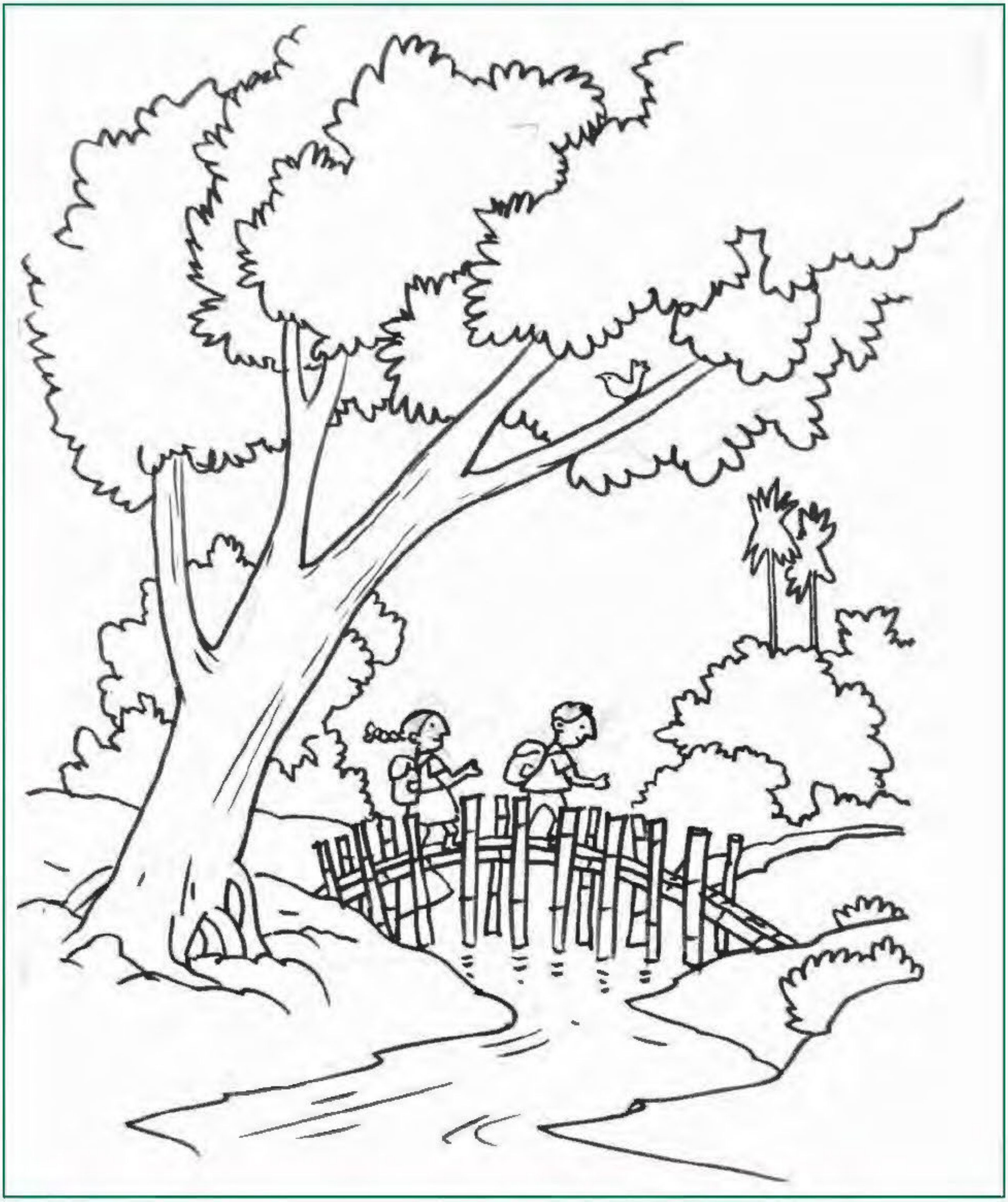

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

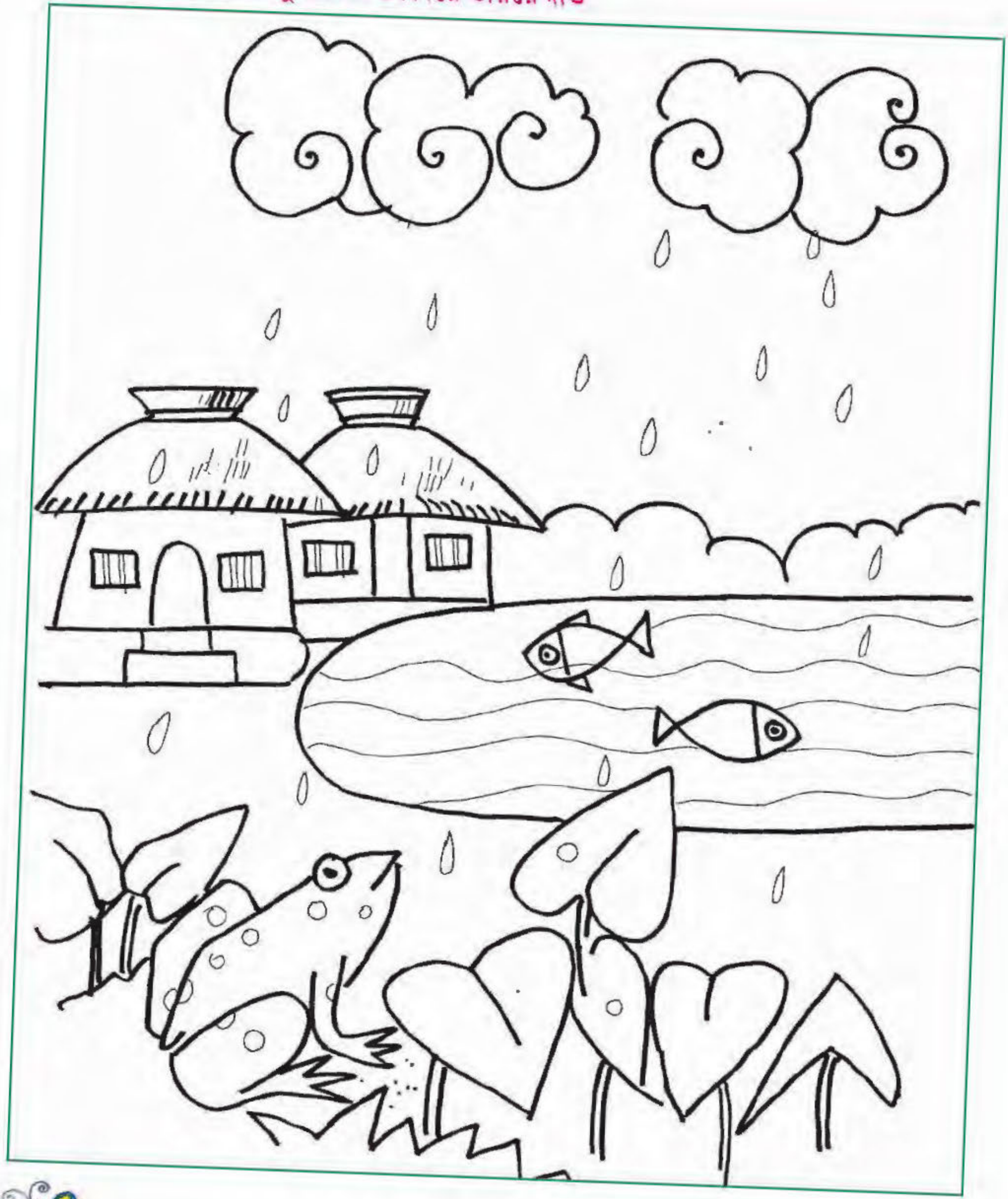

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও

আমাদের পরিবেশ (চতুর্থ শ্রেণি)

পাঠ্যসূচি

১) পরিবেশের উপাদান ও জীবজগৎ

ক) পরিবেশের পরিচিতি
খ) উদ্ভিদ বৈচিত্র্য
গ) প্রাণী বৈচিত্র্য
ঘ) প্রাণীর অভিযোজন (গমন, শ্বাসগ্রহণ, দেহের আবরণ,খাদ্যগ্রহণ ভিত্তিক)
ঙ) জীবের বিলুপ্তি ও সংরক্ষণ

২) পরিবেশের উপাদান

ক) বস্তু ও পদার্থ
খ) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা
গ) পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন
ঙ) মিশ্রণ থেকে উপাদান পৃথককরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

৩) শরীর

ক) খাদ্যগ্রহণ ও শরীরে পরিপাক
খ) অসুখ থেকে বাঁচতে খাদ্য (সুষম খাদ্য)
গ) খাদ্য ও প্রতিদিনের কাজ
ঘ) শ্বাসবায়ু ও স্বাস্থ্য

৪) আবহাওয়া ও বাসস্থান

ক) বায়ুর উপাদান
খ) আবহাওয়া ও ঋতু
গ) বাসস্থানরূপে পৃথিবী
ঘ) বেড়ানো, অচেনা জায়গা আবিষ্কার ও পৃথিবীকে চেনা

৫) আমাদের আকাশ

ক) দিন ও রাত
খ) চাঁদ
গ) তারা দেখা : ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমন্ডল
ঘ) মহাকাশ

৬) প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা

ক) জল, আগুন, গাছ, পশু, পাখি ও পাথর
খ) প্রকৌশলের বিকাশ
গ) ধাতুর ব্যবহার
ঘ) চাকা ও সভ্যতা
ঙ) যান্ত্রিক সুবিধার ধারণা
চ) দাহ্যবস্তু, বর্জ্য, বিষাক্ত প্রাণী থেকে ঝুঁকি ও নিরাপত্তা বিধিসমূহ
ছ) ওষধি গাছ ও মানুষের স্বাস্থ্য

৭) জীবিকা ও সম্পদ

ক) পশ্চিমবঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জীবিকার বৈচিত্র্য
খ) অলিখিত জ্ঞান ও শিল্প (কলা ও হাতের কাজ)
গ) লোককথা, গান, নাচ, অভিনয় ও ছবি

৮) মানুষের পরিবার ও সমাজ

ক) পরিবার থেকে সমাজ
খ) বিভিন্ন ধরনের সমাজ
গ) কৃষি ও পশুপালন
ঘ) খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও খাদ্য বিনিময়

৯) আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ

ক) মাটি, জল ও বাতাসের দূষণ
খ) দূষণের প্রভাব
গ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানব উদ্যোগ

১০) সৌধ ও সংগ্রহশালা

ক) প্রাথমিক ধারণা
খ) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা
গ) সৌধ ও সংগ্রহশালার উপযোগিতা ও সংরক্ষণ

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পরিবেশের উপাদান, জীবজগৎ, জড়বস্তুর জগৎ, শরীর, আবহাওয়া ও বাসস্থান (পৃ.১—৬৫)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : আমাদের আকাশ, প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, জীবিকা ও সম্পদ (পৃ.৬৬—১১৭)

৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : মানুষের পরিবার ও সমাজ, আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা (পৃ.১১৮—১৬০)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
১) সারণি পূরণ	১) অংশগ্রহণ
২) ছবি বিশ্লেষণ	২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
৪) দলগত কাজ ও আলোচনা	৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা
৫) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
৭) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন	
৮) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি	
৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার একটি নকশা দেওয়া হলো)

১ **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

- নীচের কোন প্রাণীটির শিরদাঁড়া নেই — (ক) আরশোলা (খ) কুনো ব্যাঙ (গ) রুই মাছ (ঘ) টিকটিকি
- ভাত কী ধরনের খাবার — (ক) শাকসবজি (খ) ফল (গ) দানাশস্য (ঘ) ফুল
- শ্বাস ছাড়ার সময় শরীরে তৈরি হওয়া যে গ্যাসটা আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, সেটা হল — (ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন (গ) নিষ্ক্রিয় গ্যাস (ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড
- টুসু পরব হয় — (ক) আষাঢ় মাসে (খ) কার্তিক মাসে (গ) পৌষ মাসে (ঘ) বৈশাখ মাসে

২ **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) আবহাওয়া বাতাসের ______ পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। (খ) মানুষ ______ পশুকে শিকার করে মাংস খেত।

(গ) আগুন জ্বালাতে ______ পাথর লাগত। (ঘ) জঙ্গলের পাশের মানুষ ______ সংগ্রহ করেন। (ঙ) সমাজ শব্দের একরকম মানে হলো ______ ।

৩ **ভুল বাক্যটির পাশে কাটা (✗) ও সঠিক বাক্যটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।**

(ক) হাতি, মানুষ আর শিম্পাঞ্জি সামাজিক প্রাণী। (খ) মানুষ ভেড়াকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল। (গ) তরলযুক্ত খাবার বায়ুশূন্য অবস্থায় কাগজের প্যাকেটে বা টিনে রাখা হয়। (ঘ) নরম মাটি দিয়ে নানান মূর্তি বা নক্সা তৈরি করা হলো টেরাকোটা। (ঙ) 'খাঁচার ভিতর' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

৪. ক ও খ স্তম্ভের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

ক স্তম্ভ		খ স্তম্ভ	
a	পদার্থ	1.	আবর্জনা
b	মাংস	2.	বাড়ির ঘুলঘুলি
c	হাতিয়ার	3.	যার ভর আছে ও যে কিছুটা জায়গা নেয়
d	কাচের টুকরো	4.	নদিয়ার কৃষ্ণনগর
e	মৃৎশিল্প	5.	অস্ত্রশস্ত্র
f	চড়াই পাখি	6.	জলসেচ ব্যবস্থা
		7.	দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে হয়

৫ . বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো (ক) নিড়ানি, কাস্তে, ট্রাকটর (খ) কুকুর, গোরু, বাঘ (গ) চাল, আলু, হিমঘর (ঘ) সিমেন্টের ধুলো, কচুরিপানা, শ্বাসকষ্ট (ঙ) তাজমহল, কোনারকের মন্দির, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ

৬. পার্থক্য দেখাও : (1) প্রশ্বাস-নিশ্বাস (2) তরল-গ্যাস (3) নির্মল বায়ু-দূষিত বায়ু (4) গ্রীষ্ম-শীত (5) পূর্ণিমা-অমাবস্যা (6) হাতিয়ার-টুল (7) কাগজ-প্লাস্টিক (8) পল্লির গান-সারি গান (9) কৃষি সমাজ-শিল্প সমাজ (10) স্থাপত্য-ভাস্কর্য

৭. একটি বাক্যে উত্তর দাও : 1) তাজমহলের সাদা মার্বেলের গায়ে ছোপ পড়ার কারণ কী? 2) বিজ্ঞানকেন্দ্রে বেড়াতে গেলে তুমি কী দেখতে পাবে? 3) পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশনয়িরা কী করেছিল? 4) দড়ি, বস্তা, ব্যাগ বানাতে কোন উপাদান কাজে লাগে? 5) চাকাকে শক্তপোক্ত করার জন্য মানুষ কী করেছিল? 6) গাছের খাবার তৈরি করতে কী কী লাগে? 7) গরমকালে বিকালে তুমি বেশি খেলার সময় পাও কেন? 8) ধাতু চিনবে কী করে? 9) শীতকাল আর বর্ষাকালের মেঘের রঙের তফাৎ কী? 10) লেপ-তোশক বানানোর সময় বাতাসে কী মিশে যায়? 11) খাবার থেকে কীভাবে শক্তি পাও তা তীর চিহ্নের মাধ্যমে বাক্সে দেখাও ☐ → ☐ → ☐ 12) খালি চোখে দেখা যায় না এমন প্রাণীদের কীভাবে দেখা যায়?

৮. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : 1) গাছের পাতাকে ব্যবহার করে কীভাবে বিভিন্ন প্রাণী বেঁচে থাকে? 2) পাখিরা আকাশে দীর্ঘ সময় ওড়ে কীভাবে? 3) কোন জিনিসের ভর কীভাবে মাপা হয়? 4) মুড়ি থেকে মুড়ির গুঁড়ো আর চাল থেকে ধানের খোসা কীভাবে আলাদা করা যায়? 5) দাঁতের কাজ কী কী? 6) আবহাওয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্যের নাম লেখো। 7) তোমার দেখা তিনটি প্রাণীর বাসস্থানের নাম লেখো। 8) তোমার ছায়ার দৈর্ঘ্য সারাদিনে কীভাবে বদলায়? 9) চাঁদের কলঙ্ক কী? 10) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আমরা কী কী বিষয় জানতে পারি? 11) আগুন ব্যবহার জানার পর মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? 12) মানুষের জীবনে গাছের তিনটি ভূমিকা লেখো। 13) লোহার জিনিস ব্যবহারের সুবিধা কী কী? 14) পুরোনো দিন থেকে আজকের চাকায় কী কী বদল ঘটেছে? 15) দৈনন্দিন জীবনে লাঠির ব্যবহারের ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়? 16) অলিখিত জ্ঞানের দুটি উদাহরণ দাও। 17) পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও মালদা জেলার নাচের বৈশিষ্ট্য কী কী? 18) আত্মীয় শব্দের অর্থ বুঝিয়ে লেখো। 19) তোমার চারপাশের সমাজের মানুষের খাবার, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখো। 20) খাবার নষ্ট না করতে মানুষ কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে? 21) জল কী কী কারণে দূষিত হয়? 22) বায়ু দূষিত হলে মানুষ ও পরিবেশের কী কী সমস্যা হয়? 23) জাদুঘরে বেড়াতে গেলে তোমার কী কী অভিজ্ঞতা হতে পারে? 24) সংগ্রহশালা কত ধরনের হতে পারে?

৯. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর :

জড় পদার্থ, জীবের কাজ, জন্তুদের খাবার, বিভিন্ন জীবের সম্পর্ক, জলের গাছের বৈশিষ্ট্য, গাছের ডালে ঝোলা জন্তুর বৈশিষ্ট্য, আকাশে ওড়া প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য, জলজ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য, হারিয়ে যাওয়া প্রাণী, পদার্থ, বস্তু, গ্যাস, কঠিন,

তরল, মিশ্রণ, দাঁড়িপাল্লা, থিতানো, অবস্থার পরিবর্তন, ছাঁকনি, দাঁতের যত্ন, প্যাকেটের খাবার, মানুষের খাদ্য, হজম, খাদ্যনালি, শক্তি, সুষম আহার, গাছের খাবার তৈরি, ফুসফুস ভালো রাখা, বাতাসের গ্যাস, গরম, বৃষ্টি, ঠান্ডা, আবহাওয়া, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলাফল, ঋতু, বাসস্থান, বিপন্ন বাসভূমি, মরুভূমি, নোনাজলের বাসস্থান, বাসস্থানরূপে বনভূমি, পরিযায়ী পাখি, জলদাপাড়া, টোটো, রাভা, মেচ, গন্ডার, ছায়া, পৃথিবীর ঘোরা, চাঁদ , গ্রহ, উপগ্রহ, চাঁদের ঘোরা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা ও নৌ-যাত্রা, মহাকাশ অভিযান, কৃত্রিম উপগ্রহ, মানুষের অগ্রগতি ও জল, আগুন ও মানুষের খাবার, আগুন ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, মানুষের জীবনে আগুন, গাছের উপকার ও মানুষের জীবন, পশুপাখির মানুষের জীবনে ভূমিকা, মানুষের প্রতিদিনের জীবন ও যন্ত্র, টুল ও তার ব্যবহার, পাথরের ব্যবহারের নানা দিক, ধাতব জিনিসপত্র ও তার ব্যবহার, মানুষের জীবনে ব্যবহৃত নানা ধাতু, ধাতুর ব্যবহারের উপকারিতা, চাকার পরিবর্তন, দাহ্যবস্তু ও বিপদ, দাহ্যবস্তু ও সাবধানতা, আবর্জনার উৎস, আবর্জনার ক্ষতিকর প্রভাব, সাপের বিষ, সাপের কামড় ও মানুষের কর্তব্য, মানুষের শরীর খারাপে ওষুধি গাছ, ভেষজ গাছ, পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, সমভূমির মানুষের জীবিকা, নকশিকাঁথা, বাঁশের ব্যবহার, মাটির কাজ, মুখোশ, ডোকরা, শিল্প, কুটির শিল্প, না-পড়ে শেখা নানা কাজ, পটচিত্র, লোককথা, লোকগান, নাচ, ছৌ, গুহাচিত্র, সমাজের নানা দিক, সমাজ তৈরির কথা, সমাজে ছেলেদের ভূমিকা, আদি সমাজ, নানা ধরনের সমাজ, চাষের নানা ধাপ, ফসল চাষের আদিকথা, ফসল চাষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পালিত প্রাণী, পোষ মানা পশু ও হিংস্র পশু, পশু পোষ মানানোর আদিকথা, মানুষের জীবনে নানা উৎসব ও চালের ব্যবহার, মাছের রান্না ও মিষ্টির রকমফের, হাটবাজার ও খাবারের বিনিময়, খাবারকে ভালো রাখা, খারাপ মাটি, জলের ব্যবহার, নোংরা জল, বাতাসের ধুলোধোঁয়া ও মানুষের কষ্ট, দূষক, বিভিন্ন ধরনের দূষক, বিশনয়, সুন্দরলাল বহুগুণা, টেরাকোটা, পুঁথি, কোনারকের সূর্যমন্দির, জামা মসজিদ, ব্যান্ডেল চার্চ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, তাজমহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর, গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম,নিজের হাতে সংগ্রহশালা বানানোর নানা উপকরণ।

১০. মিলযুক্ত শব্দগুলো খুঁজে বার করো :

শিখন পরামর্শ

স্বাগত, বন্ধুরা। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জ্ঞানগঠনের পথ প্রশস্ত করি।

শিশু ও তার শৈশব নিয়ে ভালোভাবে দেখলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও তাদের নানা কৌতূহল ও প্রশ্ন থাকে। কারণ তারা তাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। সারাক্ষণ নতুন কিছু আবিষ্কারের নতুন কোনো ডাকে সাড়া দেবার নেশায় বিভোর। আপন মনেই নতুন কিছু পড়ে তার মানে খুঁজে নেবার চেষ্টা করে। এভাবেই স্বাভাবিক উপায়ে তার চারপাশ সম্পর্কে জ্ঞানগঠনেও সাহায্য করে। সেই শিক্ষা তাকে নিজেকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রতিটি শিশুই জ্ঞান ও সংস্কৃতিভাণ্ডারের উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা তার নিজস্ব কার্যকলাপ বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে তাৎপর্য পায়। শিশু তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে নিজের মতো করে। সেকারণে ছোটো ছোটো মজার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনার মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবেই এখন থেকেই।

শিক্ষা সংগঠিত হয় নানারকম আদানপ্রদান, কথোপকথন আর কাজের মাধ্যমে। চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, বস্তু ও মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল ও নান্দনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ, প্রশ্ন অনুসন্ধান, বন্ধুদের বা বড়োদের সঙ্গে সমানুভূতি ও সহযোগিতার পরিমণ্ডলে শিশু তার জ্ঞান অর্জনের পথ প্রশস্ত করে। তাই আমরা এই বইতে দল বেঁধে কাজ করতে শেখাই । এরফলে পরস্পরের থেকে সামাজিক মূল্যবোধ ও একসঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেতে পারে। দলগতভাবে কাজ করা, হাতেকলমে কাজ, ভয়শূন্যভাবে অংশগ্রহণ, অন্যকে সাহায্য করা— এসবের মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বশিখনের আবহ সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

শিশুর পরিবেশ চর্চা যা শুরু হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণি থেকে তা অখণ্ডভাবেই এগিয়ে চলছে চতুর্থ শ্রেণিতেও তার স্থানীয় পরিবেশ ও আপন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে উপলব্ধি করতে হবে নানা বিষয়। সংলাপধর্মী এই বই শিশুকে পাঠে উৎসাহিত করবে। ছোটো ছোটো দলে অভিনয়ের সুযোগ করে দেবে। ভয়হীনভাবেই কথা বলার মধ্যে দিয়েই অর্থ খুঁজে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করবে, তবে এব্যাপারে আপনাদের সাহায্য আবশ্যক। প্রয়োজনে আপনার অঞ্চলের স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। শিশুর জ্ঞানগঠনের প্রক্রিয়া কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যাতে আবদ্ধ না থাকে সেবিষয়ে নজর দেবেন। এই বই-এ বিবৃত নানা বিষয়ের মধ্যে থেকে শিশুরা যেন তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের ছবি পায়।

জীবজগৎ থেকে শুরু করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালায় শেষ

আমার চারপাশ ও আমি

শিশু নিজের চারপাশের পরিবেশের নানা উপাদান নিয়ে আলোচনা করবে ১পৃষ্ঠা থেকে ১৭ পৃষ্ঠায়। এই অংশে আমাদের চারপাশের পরিবেশের অখণ্ডতা সামগ্রিকভাবেই তুলে ধরা আছে। চারপাশের কোন উপাদানগুলো জড়ো আর কোন উপাদানগুলি সজীব সে বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করবে। আপনি তাদের আলোচনায় উৎসাহ দেবেন, অংশগ্রহণ করবেন। প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণীকে দেখায় উৎসাহিত করবেন। তাদের গঠন, কাজ এমনকি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান গঠনে সাহায্য করবে। সূক্ষ্ম প্রাণী যেমন অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম প্রভৃতি দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেবেন, না থাকলে অবশ্যই ছবি দেখাবেন। স্থানীয়ভাবে নানা পশুপাখি পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করবেন। ইতিহাসের

পাতায় বেশ কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব জানা গেছে, যা আজ আর নেই। স্থানীয়ভাবে কোনো প্রাণী হারিয়ে গেছে কিনা তার সমীক্ষা ভবিষ্যতে বিশেষ দলিল হিসাবে গণ্য হতে পারে। এবিষয়টি যাতে শিশুরা উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য আপনারা নাটকের উপস্থাপনা করতে পারেন। লক্ষ রাখবেন শিশুরা যেন প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রশ্ন করায় উৎসাহ দিন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নানা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিষয়টি যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সে দিকে বিশেষ নজর দেবেন।

এরপর এসেছে পরিবেশের উপাদান ও জড় বস্তুর জগৎ। ১৮ থেকে ২৬ পৃষ্ঠায়। এবিষয়টি পুরোটাই শিশুকে হাতেকলমে বুঝে নেওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছে। শিশুর চারপাশের নানা জড় জিনিসপত্র কীভাবে স্থান দখল করে থাকে সেবিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এবিষয়ে শিশু যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিশ্লেষণ ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে সেবিষয়ে নজর দেবেন। এইভাবে শিশুর বিভিন্ন জড় বস্তুর ওজন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে। তবে ওজন অপেক্ষা ভর কথাটি ঠিক। সেবিষয়ে আপনি সচেতনভাবে শিশুদের ধরিয়ে দেবেন। শিশুর সামাজিক অভিজ্ঞতায় ওজন কথাটি প্রচলিত। নানারকম মিশ্রণ থেকে নানা উপাদান পৃথক করা একটা মজার খেলা। এই খেলার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলুক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুদের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও প্রয়োগের উৎসাহ দিন।

প্রসঙ্গ এসেছে ২৭ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায় খাদ্য গ্রহণ ও শ্বাসবায়ু বিষয়ে। শিশুর চারপাশের নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে তার খাবার তৈরিতে সাহায্য করে সেবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও প্যাকেট করা নানা খাবার ও বিভিন্ন প্রাণীর খাবার ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে শিশু তার স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করেও কিছু তালিকা তৈরি করতে পারে। ছবি আঁকতে পারে। নিজের মতো করে কিছু খাবারের নাম বলতে পারে। এ বিষয়ে আপনি অবশ্যই উৎসাহ দেবেন। এখানে দাঁত ও দাঁতের ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে দলবেঁধে একাজে অংশগ্রহণ করে সেবিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন। তবে এখানে দেওয়া নানা প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই বাড়ির বড়োদের এবং আপনাদের সাহায্যে জানতে পারে সেবিষয়ে সজাগ থাকবেন। খাবার খাওয়ার পর আমাদের শরীরে তা কীভাবে হজম হয় সেবিষয়ে শিশুর ভাষায় লেখা হয়েছে। আপনি ছবি/চার্ট/মডেলের মাধ্যমে বিষয়টি আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। অসুখ থেকে বাঁচতে নানা কাজ করতে কীভাবে খাবার সাহায্য করে তা স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিশুকে আলোচনায় উৎসাহিত করবেন। দেখবেন প্রতিটি শিশু যেন এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গাছের খাবার তৈরি এবং শ্বাসবায়ু ও স্বাস্থ্য নিয়ে এখানে স্বল্প আলোচনা আছে। Terminology ব্যবহার না করে শিশু নিজের ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতায় উক্ত বিষয় যাতে জ্ঞান গঠন করতে পারে সেবিষয়ে নজর দেবেন।

এরপর এসেছে আবহাওয়া ও বাসস্থান ৪৬ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠায়। প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণী শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপরও যে তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে সেবিষয়েও লেখা হয়েছে। এখানে লেখা বিভিন্ন কথোপকথন শিশুকে স্থানীয়ভাবে নিজের চারপাশের ব্যাপারে ভাবনায় উদবুদ্ধ করবে। আপনার কাজ তাদের সেই ভাবনাকে উৎসাহিত করা। এভাবেই তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে বাতাসের নানা উপাদান। আবহাওয়ার রকমফের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করবে। নানা আবহাওয়া আমাদের চারপাশের প্রকৃতির যে পরিবর্তন ঘটে সেই বিষয়ে আপনার সৃজনশীল, আনন্দদায়ক উপস্থাপনা শিশুকে আরও কৌতূহলী করে তুলবে। ঋতু পরিবর্তনের নানা রূপ নিয়ে স্থানীয় পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আপনার উপস্থাপনা শিশুকে চারপাশের বায়ুমন্ডল ও তার নিজস্ব চৌহদ্দির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলবে। শিশু তার চারপাশের নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করবে। প্রত্যেকেরই যে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় প্রয়োজন সেবিষয়ে সহানুভূতিশীল হবে। আপনার কাজ হবে তাদের এই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া, তাদের নানা কৌতূহল নিবৃত্ত করা। বিভিন্ন সাহিত্যে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের আশ্রয়হীন হয়ে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি তুলে ধরবেন। আসলে ভবিষ্যতে সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশ নির্মাণে আপনার সহায়তায় আজকের শিশুরা উৎসাহিত হয়ে

উঠবে। অজানাকে জানার অচেনাকে চেনার শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই শিশু প্রতিটি মুহূর্তে কৌতূহলী হয়ে থাকে। আমাদের কাজ তাদের এই প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়ে দেওয়া। অচেনার আনন্দ অনুভব করতে দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। নিকটেই লুকিয়ে রয়েছে নানা আনন্দ। আপনার সাহায্যে শুরু হোক সেই আনন্দ খোঁজার পালা।

রাতের আকাশে তারা খুঁজতে খুঁজতে এসে গেছে আমাদের আকাশ প্রসঙ্গ। ৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৭৬ পৃষ্ঠা আমাদের আকাশ। হাতের কাছে থাকা টর্চ, পেন প্রভৃতির ব্যবহারে দিনরাতের প্রসঙ্গকে সহজ করে তুলে ধরা হয়েছে। আপনার কাজ শ্রেণিতে ছোটো ছোটো প্রদর্শনের মাধ্যমে এবিষয়টিকে আরও সহজ করে তোলা। আপনার সাহায্যেই শুরু হোক রাতের আকাশে তারা দেখা, মেঘেদের আনাগোনা দেখা। শিশু আপন মনে খুঁজে নিক তার জীবনের ছন্দ।

পরের বিষয় 'প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা' ৭৭ থেকে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। সভ্যতার বিকাশে জলের অবদান নিয়ে এবিষয়টি শুরু। বেঁচে থাকার জন্য জল কতটা জরুরি সেবিষয়ে শিশুকে অংশগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তারপর সভ্যতা বিকাশে জল, আগুন, পাথর, চাকা, ধাতু, লাঠি এবং সর্বোপরি গাছ কীভাবে সাহায্য করে সেবিষয়ে মজা করে লেখা আছে। যাতে শিশু বিষয়টি পাঠ করতে পারে। আগুন, ধাতু ও চাকার আবিষ্কার কীভাবে আমাদের সমাজজীবনকে পালটে দিল তার ইতিহাস জানবে ও প্রয়োগ করতে শিখবে। যন্ত্রের নানা ব্যবহার নিয়ে আলোচনা বিষয়টিকে যাতে নতুন মাত্রা দেয় সেবিষয়ে লক্ষ রাখবে। এমনিতে শিশুর যন্ত্র বিষয়ে অপার কৌতূহল থাকে। তবে এবিষয়ে বড়োদের সচেতন থাকাই ভালো। এবিষয়টির শেষ দিকে শিশুর চারপাশের পরিবেশ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা হিসাবে সাপের কামড়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে আপনার যথাযথ উপস্থাপনা শিশুর জ্ঞান গঠনের পথকে সঠিক দিশা দেখাবে। ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার ও আলোচনা স্বাস্থ্যসুরক্ষার দিকটিকে আলোকপাত করবে। তবে এব্যাপারে চার্ট, মডেল ও অডিয়ো-ভিশুয়ালের ব্যবহারে বিষয়টিকে আরও প্রাণবন্ত করা দরকার।

এরপরের বিষয় জীবিকা ও সম্পদ ১০০ পৃষ্ঠা থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা। সম্ভাব্য প্রসঙ্গ ধরে নানারকম গল্প করে বোঝানো হয়েছে যে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বিভিন্ন জীবিকার কথা। নানা আলোচনা ও স্থানীয় বিষয়ে খোঁজখবর করে শিশুমনে জীবিকা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে। স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে এসব সন্ধান তাকে নতুন পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করবে। চাষের ইতিহাস থেকে শুরু করে এখনকার দিনে চাষবাসে নানা যন্ত্রের ব্যবহারের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। কিছুটা হয়তো অনেক দূরের ইতিহাস। কিছুটা কাছের, পাশাপাশি অত্যাধুনিক নানা যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে পশু-পাখির ব্যবহার প্রসঙ্গে শিশুর স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেবেন। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষে অডিয়ো/ভিশুয়ালের মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন চাষবাসের পাশাপাশি শিল্পও যে প্রয়োজন সেবিষয়ে শিশুমনে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে। পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে শিল্প গড়ে তোলা যায় সেবিষয়ে আলোচনা আসবে। আমাদের নানা জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা শিল্প। যা কোনো বিশেষ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা হয়নি। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষই তার স্রষ্টা। সেবিষয়ে শিশু যাতে স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে খোঁজখবর করে সে দিকে নজর দেবেন। প্রয়োজনে স্থানীয় শিল্পীদের বিদ্যালয়ে এনে আলাপ করতে পারেন। এতে শিশুরাও উৎসাহ পাবে। শিল্পকলা ও চারুকলা চর্চার প্রসারে শিশুদের প্রাথমিক ধারণা নির্মাণ করতে এই বিষয়।

১১৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে মানুষের পরিবার ও সমাজ। গল্পচ্ছলে, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শিশুমনে সমাজের ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে আপনি স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই ধারণাকে আরো সহজ করে তুলতে পারেন। ইতিহাসের পথ ধরে সমাজ সৃষ্টির ধারণা তৈরি করা হয়েছে। নানা সমাজের নানা খাদ্যাভ্যাস। খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। আপনি এবিষয়ে ওদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন। এবিষয়ে অনুসন্ধানে শিশুদের আরো উৎসাহ দিন।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হয়েছে আবার বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবেশ সংরক্ষণ করার প্রয়াসও শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে সুন্দর পরিবেশ নির্মাণে আজকের শিশুদের অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। তাই এই ব্যাপারে ১৪০ পৃষ্ঠা থেকে ১৫২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টিতে আকর্ষণীয় ছবি ও গল্পের সমাহারে শিশুদের তার স্থানীয় অঞ্চলের জল, বায়ু, মাটির দূষণের নানা ব্যাপারে খোঁজখবর করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণে এই বিষয় আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক। তবে এই দূষণ থেকে উত্তরণের উপায় যেমন শিশুরাই উদ্ভাবন করবে তেমন কিছু উদাহরণ হিসাবে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে। আপনার আরো সংযোজন এই বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। স্থানীয়ভাবে যাতে শিশুরা কাজ করতে পারে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে আপনি স্থানীয় পরিবেশ সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

বিচিত্র ও বিরাট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ আমাদের শিশুরা। তাদের মনে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি ও মজুত ভাণ্ডারকে সংহত ও উন্মুক্ত করতে হবে। তাই ১৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা। আমাদের প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এর নানা নিদর্শন। স্থানীয় মন্দির/মসজিদ/গির্জা পর্যবেক্ষণ ও তাদের ইতিহাস অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠুক আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। তাই এবিষয়ে আপনাদের সাহায্য বিশেষভাবে দরকার। এর মধ্য দিয়েই শিশুমনে তৈরি হবে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, যা একান্তভাবে শুরু হবে স্থানীয়স্তরেই। আমাদের নানা স্থাপত্যের গায়ে মানুষের নানা শিল্পকলা দু-চোখ ভরে দেখতে উৎসাহ দিন শিশুদের, তাদের সেবিষয়ে ছবি আঁকতে দিন। হয়তো কাছাকাছি কোনো সংগ্রহশালা নেই। তাতে কী, শিশুরা নিজেরাই সংগ্রহশালা গড়ে তুলুক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে ঘর না থাকলে, বছরের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে প্রর্দশনী করুন। এখানে কিছু সংগ্রহশালার ছবি দেওয়া আছে। সেখানে বেড়াতেও নিয়ে যেতে পারেন। তবে এসব সংগ্রহশালার যে বিবরণ দেওয়া আছে সেখান থেকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। এটা নিছকই ওদের আনন্দ দেওয়ার জন্য।

উপসংহার

শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিকাশ ও পছন্দ বিচার করতে হবে। সেই কারণে তথ্যসংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করতে হবে আর শিক্ষার্থীর কাজগুলি গভীরভাবে লক্ষ করতে হবে। তবে শিশুর স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের রিপোর্ট কার্ড অনুযায়ী নিয়মিত সমীক্ষার দ্বারা শিশুর শিখনের জন্য মূল্যায়ন করা খুবই জরুরি। শিশু প্রতিটি বিষয়ের আনন্দদায়ক শিখন-শিক্ষণে কতটা অংশগ্রহণ করতে পারছে তা দেখা আমাদের বিশেষ কর্তব্য। পড়া, লেখা, শোনায় তার আগ্রহ কতটা তা দেখা ভীষণ জরুরি। শিশু বইটি পাঠে আনন্দ পাচ্ছে কিনা, বন্ধুদের সঙ্গে পাঠের নানা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা সেবিষয়ে নিয়মিত নজর দেওয়া প্রয়োজন। শিশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন। অনুসন্ধানে আরো বেশি করে আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, যাতে সে তার মতো ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রয়োগ করতে পারে তার সুযোগ করে দিন। প্রত্যেকের কাজের প্রশংসা করুন। কাউকে ভুল বলবেন না, তবে যা দেখছেন সেবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করুন যাতে শিশুর বিকাশের মূল্যায়ন করা যায়। সেইমতো ঘাটতি/ অসুবিধা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শিখনের জন্য মূল্যায়নে শিশুর শিক্ষণের মান ও বিকাশ সম্পর্কে অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করানো যেতে পারে। মনে রাখবেন এই প্রক্রিয়া কখনোই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহিত করার জন্য নয়। শিশু তার কর্মসম্পাদনে কতটা সহানুভূতিশীল এবং সহযোগিতাপূর্ণ সেবিষয়েও বিশেষ নজর থাকবে, যা শিশুকে সৃষ্টিশীল ও নানা কাজে উৎসাহ জোগাবে। শিশুর বিভিন্ন পারদর্শিতা বুঝতে প্রতিটি পাঠে দেওয়া নানা কর্মপত্র এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আপনার সাহায্যে করা নানা কাজের মাধ্যমে এই মূল্যায়ন আপনি করতে পারেন। পরিশেষে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সামগ্রিক শিখনের ওপর পরীক্ষা নিতে পারেন। তবে প্রশ্ন করার সময় খেয়াল রাখবেন উত্তর যেন তাদের নিজ নিজ বিষয়ে বা কাজের নিরিখেই দিতে পারে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়েও।